টেনিদা সমগ্র

টেনিদা আর সিন্ধুঘোটক

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সূচিপত্র

- গড়ের মাঠ 2
- গাড়িটা বাজে. 9
- যেতে হল পাশের একটা ছোট ঘরে. 24
- সেই বাড়ি থেকে 30
- স্টুডিয়ো মানে. 38
- সিনেমা দেখতে গিয়েছিলুম 48
- তারপর যা বললেন. 53

গড়ের মাঠ

গড়ের মাঠ। সারাটা দিন দারুণ গরম গেছে, হাড়ে-মাংসে যেন আগুনের আলপিন। ফুটছিল। এই সন্ধ্যেবেলায় আমি আর টেনিদা গড়ের মাঠে এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। কেল্লার এ-ধারটা বেশ নিরিবিলি, অল্প-অল্প আলো-আঁধারি, গঙ্গা থেকে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া।

একটা শুকনো ঘাসের শিষ চিবুতে চিবুতে টেনিদা বললে, ধ্যেৎ।

–কী হল?

–সব বাজে লাগছে। এমন গরমের ছুটিটা–লোকে আরাম করে সিমলা-শিলং বেড়াতে যাচ্ছে আর আমরা এখানে বসে বসে স্রেফ বেগুনপোড়া হচ্ছি। বোগাস!

–একমন বরফ কিনে তার ওপর শুয়ে থাকলেই পারো–আমি ওকে উপদেশ দিলুম। টেনিদা তক্ষুনি হাত বাড়িয়ে বললে, টাকা দে।

–কীসের টাকা?

–বরফ কেনবার।

–আমি টাকা পাব কোথায়?

টাকা যদি দিতে পারবিনে, তা হলে বুদ্ধি জোগাতে বলেছিল কে র‍্যা?–টেনিদা দাঁত খিচোল বিচ্ছিরিভাবে; ইদিকে গরমের জ্বালায় আমি ব্যাং-পোড়া হয়ে গেলুম আর উনি বসে বসে ধ্যাষ্টামো করছেন।

–এখন গরম আবার কোথায়–আমি টেনিদাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলুম : কেমন মনোরম রাত, গঙ্গার শীতল বাতাস বইছে–আরও একটু কবিতা করে বললুম : পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির

নিশির শিশির।—টেনিদা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল : দ্যাখ প্যালা, ফাজলামিরও লিমিট আছে। এই জষ্টিমাসে শিশির! দেখা দিকিনি, কোথায় তোর শিশির।

ভারি ল্যাঠায় ফেলল তো! এরকম কাঠগোঁয়ার বেরসিকের কাছে কবিতা-টবিতা বলতে যাওয়াই বোকামো। আমি অনেকক্ষণ মাথাটাথা চুলকে শেষে একটু বুদ্ধি করে বললুম, আচ্ছা, কালকে সকালে তোমাকে শিশির দেখাব, মানে সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট থেকে শিশিরদা-কে ডেকে আনব।

বুদ্ধি করে আগেই সরে গিয়েছিলুম, তাই টেনিদার চাঁটিটা আমার কানের পাশ দিয়ে বোঁ করে বেরিয়ে গেল। টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, তুই আজকাল ভারি ওস্তাদ হয়ে গেছিস। কিন্তু এই আমি তোকে লাস্ট ওয়ার্নিং দিলুম। ফের যদি গুরুজনের সঙ্গে ইয়ার্কি করবি, তা হলে এক ঘুষিতে তোকে–

আমি বললুম, ঘুষুড়িতে উড়িয়ে দেবে!

বদমেজাজী হলে কী হয়, টেনিদা গুণের কদর বোঝে। সঙ্গে সঙ্গে একগাল হেসে ফেলল।

-ঘুষি দিয়ে ঘুষুড়িতে ওড়ানো। এটা তো বেশ নতুন শোনাল। এর আগে তো কখনও বলিসনি!

আমি চোখ পিটপিট করে কায়দাসে বললুম, হুঁ হুঁ—আমি আরও অনেক বলতে পারি। সব একসঙ্গে ফাঁস করি না, স্টকে রেখে দিই।

—আচ্ছা, স্টক থেকে আরও দু-চারটে বের কর দিকি।

আমি বললুম, চাঁটি দিয়ে চাটগাঁয় পাঠানো, চিমটি কেটে চিমেশপুরে চালান করা–

-চিমেশপুর? সে আবার কোথায়?

–ঠিক বলতে পারব না। তবে আছে কোথাও নিশ্চয়।

–তোর মুণ্ডু।–টেনিদা হঠাৎ ভাবুকের মতো ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল। খানিকক্ষণ ড্যাবড্যাব করে আকাশের তারা-টারা দেখল খুব সম্ভব, তারপর করুণ স্বরে বললে, ডাক-ডাক!

–কাকে ডাকব টেনিদা? ভগবানকে?

–আঃ, কচুপোড়া খেলে যা! খামকা ভগবানকে ডাকতে যাবি কেন? আর তোর ডাক শুনতে তো ভগবানের বয়ে গেছে। ডাক ওই আইসক্রিমওলাকে।

আমার সন্দেহ হল।

–পয়সা কে দেবে?

–তুই-ই দিবি। একটু আগেই তো একমন বরফের ফরমাশ করছিলি।

বোকামোর দাম দিতে হল। আইসক্রিম শেষ করে, কাঠিটাকে অনেকক্ষণ ধরে চেটেপুটে পরিষ্কার করে টেনিদা ঘাসের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তে যাচ্ছে, হঠাৎ-ফ্যাঁচ।

আমিই হেঁচে ফেললুম। একটা মশা-টশা কী যেন আমার নাকের ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল।

টেনিদা চটে উঠল : এই, হাঁচলি যে?

–হাঁচি পেলে।

—পেল? আমি শুতে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময়েই তুই হাঁচলি? যদি একটা ভালোমন্দ হয়ে যায়? মনে কর এই যদি আমার শেষ শোয়া হয়? যদি শুয়েই আমি হার্টফেল করি?

বললুম অসম্ভব! স্কুল ফাইনালে তুমি এত বেশি হার্টফেল করেছ যে সব ফেলপ্রুফ হয়ে গেছে।

টেনিদা বোধহয় এক চাঁটিতে আমাকে চাটগাঁয়ে পাঠানোর জন্যেই উঠে বসতে যাচ্ছিল, ঠিক তক্ষুনি ঘটে গেল ব্যাপারটা।

কে যেন মোটা গলায় বললে, ওঠো হে কম্বলরাম–গেট আপ!

আমরা দুজনেই একসঙ্গে দারুণভাবে চমকে উঠলুম।

দুটো লোক আমাদের দুপাশে দাঁড়িয়ে। একজন তালগাছের মতো রোগা আর ঢ্যাঙা, এই দারুণ গরমেও তার মাথাটাথা সব একটা কালো র‍্যাপার দিয়ে জড়ানো। আর একজন ষাঁড়ের মতো জোয়ান, পরনে পেটুলুন, গায়ে হাতকাটা গেঞ্জি। তারও নাকের ওপর একটা ফুলকাটা রুমাল বাঁধা আছে।

এবার সেই রোগা লোকটা হাঁড়িচাঁচার মতো চ্যাঁ-চ্যাঁ গলায় বললে, আর পালাতে পারবে না কম্বলরাম, তোমার সব ওস্তাদি এবার খতম। ওঠো বলছি–

টেনিদা হাঁকপাঁক করে উঠে বসেছিল। দাঁত খিঁচিয়ে বললে, কে মশাইরা এই গরমের ভেতরে এসে খামকা কম্বল কম্বল বলে চ্যাঁচাচ্ছেন? এখানে কাঁথা কম্বল বলে কেউ নেই। আমরা কী বলে ইয়ে—এই গঙ্গার শীতল সমীর-টমীর সেবন করছি, এখন আমাদের ডিসটার্ব করবেন না!

—ও, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না দেখছি! ষণ্ডা লোকটা ফস করে প্যান্টের পকেট থেকে কী একটা বের করে বললে, দেখছ?

www.bengaliebook.com

দেখেই আমার চোখ চড়াৎ করে কপালে চড়ে গেল। আমি কাঁউ-মাউ করে বললুম, পিস্তল!

ঢ্যাঙা লোকটা বললে, আলবাত পিস্তল! আমার হাতেও একটা রয়েছে। এ-দিয়ে কী হয়, জানো? দুম করে আওয়াজ বেরোয়ধাঁ করে গুলি ছোটে, যার গায়ে লাগে সে দেন অ্যান্ড দেয়ার দুনিয়া থেকে কেটে পড়ে।

টেনিদার মতো বেপরোয়া লিডারেরও মুখ-টুখ শুকিয়ে প্রায় আলুকাবলির মতো হয়ে গেছে, খাঁড়ার মতো লম্বা-নাকটা ঝুলে পড়েছে নীচের দিকে। কুক্ষণে বেশ কায়দা করে দুজনে একটা নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়েছিলুম–আশেপাশে লোকজন কোথাও কেউ নেই! চেঁচিয়ে ডাক ছাড়লে, দু-পাঁচজন নিশ্চয় শুনতে পাবে, কিন্তু আমরা আর তাদের বিশেষ কিছু শোনাতে পারব না, তার আগেই দু-দুটো পিস্তলের গুলিতে আমাদের দুনিয়া থেকে কেটে পড়তে হবে! একেবারে দেন অ্যান্ড দেয়ার!

আমার সেই ছেলেবেলার পিলেটা আবার যেন নতুন করে লাফাতে শুরু করল, কানের ভেতরে যেন ঝিঝি পোকারা ঝিঝি করতে লাগল, নাকের মধ্যে উচ্চিংড়েরা দাঁড়া নেড়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে এমনি মনে হতে লাগল! ভীষণ ইচ্ছে করতে লাগল অজ্ঞান হয়ে যাই, কিন্তু দু-দুটো পিস্তলের ভয়ে কিছুতেই অজ্ঞান হতে পারলুম না।

টেনিদা-ই আবার সাহস করে, বেশ চিনি-মাখানো মোলায়েম গলায় তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলতে লাগল : দেখুন মশাইরা, আপনারা ভীষণ ভুল করছেন। এখানে কম্বল বলে কেউ নেই, কম্বল বলে কাউকে আমরা চিনি না, শীতকালে আমরা কম্বল গায়ে দিই না–লেপের তলায় শুয়ে থাকি। এ হল আমার বন্ধু পটলডাঙার প্যালারাম, আর আমি হচ্ছি শ্রীমান টেনি, মানে–

মোটা লোকটা ঘোঁত-ঘোঁত করে বললে, মানে কম্বলরাম। প্যালারামের বন্ধু কম্বলরাম রাম রামে মিলে গেছে। যাকে বলে, রামে এক, রামে দো! ঘুঘু খুঁত

শেষের বিটকেল আওয়াজটা বের করল নাক দিয়ে। হাসল বলে মনে হল। আর সেই বিচ্ছিরি হাসিটা শুনে অত দুঃখের ভেতরেও আমার পিত্তিসুষ্ঠু জ্বালা করে উঠল।

সেই ঢ্যাঙা লোকটা খ্যাচম্যাচ করে বললেন, কী হাসি মস্করা করছ হে অবলাকান্ত। ফস করে একটা পুলিশ-ফুলিশ এসে যাবে, তা হলেই কেলেঙ্কারি। ওদিকে সিন্ধুঘোটক তখন থেকে খাপ পেতে বসে রয়েছে, কম্বলরামকে নিয়ে তাড়াতাড়ি না ফিরলে আমাদের জ্যান্ত চিবিয়ে খাবে! চলোচলো! ওঠো হে কম্বলরাম, আর দেরি নয়। গাড়ি রেডিই রয়েছে।

রেডি রয়েছে, তাতে আর সন্দেহ কী! একটু দূরেই দরজাবন্ধ একটা ঘোড়ার গাড়ি ঠায় দাঁড়িয়ে। বুঝতে পারলুম, ওটা কম্বলরামকেই অভ্যর্থনা করবার জন্যে এসেছে।

টেনিদা বললে, দেখুন বুঝতে পারছেন–

–আমাদের আর বোঝাতে হবে না, সিন্ধুঘোটককেই সব বুঝিয়ো। নাও–চলো–বলেই ঢ্যাঙা লোকটা পিস্তলের নল টেনিদার পিঠে ঠেকিয়ে দিলে।

আর এ-অবস্থায় হাত তুলে নির্বিবাদে সুড়সুড় করে হেঁটে যেতে হয়, গোয়েন্দার গল্পের বইতে এই রকমই লেখা আছে। টেনিদা ঠিক তাই করল। আমি সরে পড়ব ভাবছি–দেখি বেঁটে লোকটার পিস্তলের নল আমাকেও খোঁচা দিচ্ছে!

–বা-রে, আমাকে কেন?–আমি ভাঙা গলায় বলতে চেষ্টা করলুম : আমি তো কম্বলরাম নই।

–না, তুমি কম্বলের দোস্ত কাঁথারাম! তোমাকে ছেড়ে দিই, তুমি দৌড়ে পুলিসে খবর দাও–আর ওরা গাড়ি ছুটিয়ে আমাদের ধরে ফেলুক! চালাকি চলবে না, চাঁদ–চলো!

এ-অবস্থায় হেমেন্দ্রকুমারের জয়ন্ত পর্যন্ত চলতে বাধ্য হয়, আমি কোন্ ছার! আমরা চললুম, ঘোড়ার গাড়িতে উঠলুম, গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল, আর গাড়ি গড়গড়িয়ে চলতে

শুরু করে দিলে।

হায় গঙ্গার শীতল সমীর! বেশ বুঝতে পারলুম, এই আমাদের বারোটা বেজে গেল!

গাড়িটা বাজে

গাড়িটা বাজে—একদম লক্কড়-মাকা। ছক্কর-ছক্কর করে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। কোন্ চুলোয় যে যাচ্ছে বোঝবার জো নেই। সেই জাঁদরেল অবলাকান্ত প্রায় আমাকে চেপ্টে বসে আছে—ওর নাম যদি অবলাকান্ত হয়, তবে বলেন্দ্রনাথের মানে, স্বয়ং সিন্ধুঘোটকের চেহারা যে কেমন হবে কে জানে! দরজা খোলবার জো নেই—এমন কি, কথাটি কইবার জো নেই। টেনিদা একবার বলতে চেষ্টা করেছিল, ও মশাই, খামকা ভুল লোককে হয়রান করে

ঢ্যাঙা লোকটা খ্যাঁ-খাঁ করে বললে, চোপ!

—যাকে তাকে কম্বলরাম ঠাউরে-

—যাকে তাকে? এমনি খাঁড়ার মতো নাক, এমনি চেহারা-কম্বলরাম ছাড়া আর, কারও হয়? কম্বলরামের কোনও যমজ ভাই নেই, তিনকুলে তার কেউ আছে বলেও আমরা শুনিনি। ইয়ার্কি?

-স্যার, দয়া করে যদি পটলডাঙায় একটা খবর নেন

-শাট আপ ইয়োর পটলডাঙা-আলুডাঙা! আর একটা কথা বলেছ কি, এই পিস্তলের এক গুলিতে-

কাজেই আমরা চুপ করে আছি। যা হওয়ার হয়ে যাক। শুধু থেকে থেকে আমার পেটের ভেতর থেকে কেমন গুড়গুড় করে একটা কান্না উঠে আসছিল। আর কখনও পটলডাঙায় ফিরে যেতে পারব না, আর কোনওদিন পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খেতে পাব না। টেনিদার সঙ্গে আড্ডা দিয়েই আমার এই সর্বনাশ হয়ে গেল। মেজদা ঠিকই বলে, ওই টেনিদার চ্যালা হয়েই প্যালা স্রেফ গোল্লায় গেল।

আমি তখন বিশ্বাস করিনি। ভাবলুম, যে যাই বলুক, টেনিদা একজন সত্যিকারের গ্রেটম্যান। দু-একটা চাঁটি-টাঁটি লাগায়, জোর করে খাওয়া-টাওয়াও আদায় করে, কিন্তু আসলে তার মেজাজটা ভীষণ ভালো, বিপদ-টিপদ হলে লিডারের মতো বুক ঠুকে সামনে এগিয়ে যায়। কিন্তু সে যে এত মারাত্মক কম্বলরাম হলেও হতে পারে, আর কোথাকার এক বিটকেল সিন্ধুঘোটক তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, এ জানলে কে তার ত্রিসীমানায় এগোত।

ওদিকে হঠাৎ অবলকান্ত খ্যাঁ-খাঁ করে হেসে উঠল। বললে, ঘেঁটুদা!

ঘেঁটুদা, ওরফে ঢ্যাঙা লোকটা বললে, কী বলছ হে অবলকান্ত?

—এটা যে কম্বলরাম, তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই।

ঘেঁটুদা বললে, আলবাত!

অবলাকান্ত বললে, তা না হলে এমন ডোম্বলরাম হয়।

ঘেঁটুদা বললে, নির্ঘাত! ডোম্বলরাম বলে ডোম্বলরাম!

অবলাকান্ত বললে, হ্যাঁ, ভোম্বলরামও বলা যায়।

বলেই দুজনে খ্যাঁ-খ্যাঁ করে হেসে উঠল।

আমরা নিজের জ্বালায় মরছি, কিন্তু ওদের যে কেন এত হাসি পেল, সে আমি বুঝতে পারলুম না। জুলজুল করে আমি একবার টেনিদার দিকে চেয়ে দেখলুম। গাড়ির ভেতরে ওকে ভালো দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না, কিন্তু যেটুকু দেখলুম তাতে মনে হল রাগে ওর দাঁত কিড়মিড় করছে। নিতান্তই দু-দুটো পিস্তল না থাকলে এতক্ষণে একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যেত।

গাড়িটা চলছে তো চলছেই। মাঝে-মাঝে গাড়োয়ান এক-একবার জিভে-টাকায় এক-একটা কটকট আওয়াজ করছে, আর সাঁই সাঁই করে চাবুক হাঁকড়াচ্ছে। গাড়িটার থামবার নামই নেই। একসময় মনে হল, পিচের রাস্তা ছেড়ে খোয়াওঠা পথ ধরল আর থেকে-থেকে এক-একটা বেয়াড়া ঝাঁকুনিতে পিলেসুদ্ধু নড়ে যেতে লাগল।

এতক্ষণ পথের পাশে গাড়ি-টাড়ির আওয়াজ পাচ্ছিলুম, ট্রামের ঘণ্টি কানে আসছিল, লোকের গলা পাওয়া যাচ্ছিল, কানে আসছিল রেডিয়ো-টেডিয়োর শব্দ। এখন মনে হল, হঠাৎ যেন সব নিঝুম মেরে গেছে, কোথায় যেন ঝিঝি-টিঝি ডাকছে, থেকে থেকে পেঁকো গন্ধ বন্ধ গাড়ির ভেতরেও এসে ঢুকছে। তার মানে উদ্ধারের শেষ আশাটুকুও গেল। এখন আমরা চলেছি একেবারে সিন্ধুঘোটকের খপ্পরে—কোন্ পোড়াবাড়ির পাতালে নিয়ে আমাদের দুম করে গুম করে ফেলবে—কে জানে!

হঠাৎ ক্যাবলার কথা মনে পড়ে আমার ভারি রাগ হতে লাগল। ক্যাবলা বলে ওসব গোয়েন্দা-গল্প স্রেফ গাঁজা বানিয়ে বানিয়ে লেখে, আমি এক বর্ণও বিশ্বাস করি না। কিন্তু আজ রাতে সিন্ধুঘোটকের পাল্লায়-

খ্যাড়—খ্যাড়-খ্যাড়াৎ-

গাড়িটা কাত হয়ে উল্টে পড়তে-পড়তে সামলে নিলে মনে হল, কোনও নালাফালায় নেমে যাচ্ছিল। আমি একেবারে অবলাকান্তের ঘাড়ে গিয়ে পড়লুম—সে বললে, উঁহু-উঁহু, নাকটা গেল মশাই। ওদিকে ঘেঁটুদার গলা থেকে আওয়াজ বেরুল : ক্যাঁক—গেলুম!

আর তক্ষুনি টেনিদা বললে, ঘেঁটুচন্দর—এবার! তোমার পিস্তল তো কেড়ে নিয়েছি আগে তোমার দফা নিকেশ করে ছাড়ব!

আমি চমকে উঠলাম। অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছি না, কিন্তু বুঝতে পারলুম, গাড়িটা কাত হওয়ার ঝাঁকুনিতে টেনিদা সুযোগ পেয়ে ফস করে ঘেঁটুর পিস্তলটা ছিনিয়ে নিয়েছে! একেই বলে লিডার। কিন্তু অবলাকান্তের হাতে তো পিস্তলটা এখনও রয়েছে। টেনিদা না হয় ঘেঁটুকে ম্যানেজ করল, কিন্তু অবলাকান্ত যে এক্ষুনি আমায় সাবাড় করে দেবে।

টেনিদা বললে, ওয়ান-টু-থ্রি। শিগগির গাড়ির দরজা খোলো, নইলে–

আমি তো কাঠ হয়ে বসে আছি–খালি মনে হচ্ছে, এখুনি আমি গেলুম। এইবারে দু-দুটো পিস্তলের আওয়াজ–ঘেঁটুচন্দর চিত, আমারও বাতচিত চিরতরে ফিনিশ! তারপর রইল টেনিদা আর অবলাকান্ত কিন্তু মহাযুদ্ধের সেই শেষ অংশটা আমি আর দেখতে পাব না, কারণ আমি ততক্ষণে দুনিয়া থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছি।

গোয়েন্দা-উপন্যাসে এসব জায়গায় একটা দারুণ অবস্থার সৃষ্টি হয়। পড়তে-পড়তে লোকের মাথার চুল খাড়া হয়ে যায়। অথচ ঘেঁটু আর অবলাকান্ত হঠাৎ খাঁ খাঁ করে অট্টহাসি হাসল।

টেনিদা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই অবলাকান্ত বললে, শাবাশ কম্বলরাম, তুমি বীর বটে। তোমার বীরত্ব দেখে আমার চন্দ্রগুপ্ত নাটকের পার্ট বলতে ইচ্ছে করছে। আলেকজান্ডারের মতো–যাও বীর, মুক্ত তুমি। কিন্তু সে আর হওয়ার জো নেই, কারণ। আমরা সিন্ধুঘোটকের আস্তানায় ঢুকে পড়েছি।

আর তক্ষুনি চট করে গাড়িটা থেমে গেল। কোচোয়ান ঘরঘর করে গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে বললে, নামো।

টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল : সাবধান, আমি এখুনি গুলি ছুঁড়ব বলে দিচ্ছি–আমার হাতে পিস্তল–

বলতে বলতে গাড়ির ওধারটা খুলে অবলাকান্ত টপ করে নেমে গেল। আর ঘেঁটুদা বললে– থাম ছোকরা, বেশি বকিসনি। পিস্তল-ফিস্তল ছুড়ে আর দরকার নেই, নেবে আয়

আর এদিক থেকে অবলাকান্ত এক হ্যাঁচকায় আমাকে নামিয়ে ফেলল, ওদিক থেকে টেনিদা আর ঘেঁটুদা জড়াজড়ি করতে করতে একসঙ্গে কুমড়োর মতো গড়িয়ে পড়ল গাড়ি থেকে।

আমি দেখলুম, সামনে একটা ভুতুড়ে চেহারার পোড়োমতো পুরনো বাড়ি। তার ভাঙা সিঁড়ির সামনে গাড়ি এসে থেমেছে, চারজন লোক দুটো লুণ্ঠন হাতে করে এগিয়ে আসছে। আমাদের দিকে।

একজন হেঁড়ে গলায় বললে, কী ব্যাপার কুস্তি লড়ছে কারা?

টেনিদা ততক্ষণে ধাঁ করে একটা ল্যাং কষিয়ে ঘেঁটুকে উল্টে ফেলে দিয়েছিল। ঘেঁটু গ্যাঙাতে-গ্যাঙাতে উঠে দাঁড়াল। বললে, তোমরা তো বেশ লোক, হে! দিব্যি বুঝিয়ে দিলে, কম্বলরামটা এক নম্বরের ভিতু, একটু ভয় দেখালেই ভিরমি খেয়ে পড়বে। এ তো দেখছি। সমানে লড়ে যাচ্ছে, আবার একটা প্যাঁচ কষিয়ে আমায় চিত করে ফেললে। ইঃ–একগাদা গোবর-টোবর না কীসের মধ্যে যেন ফেলে দিয়েছে হেকী গন্ধ। ওয়াক।

টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল : হুঁশিয়ার, আমার হাতে তৈরি পিস্তল।

লোক চারটে থমকে দাঁড়িয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। শেষে একজন বললে, পিস্তল! পিস্তল আবার কোত্থেকে এল হে।

অবলাকান্ত বললে, দুত্তোর পিস্তল। সেই যে কম্বলরামকে ভয় দেখাব বলে ফিরিওলার কাছ থেকে আড়াই টাকা দিয়ে দুটো কিনেছিলুম, তারই একটা কেড়ে নিয়েছে আর তখন। থেকে শাসাচ্ছে আমাদের। বলেই আমার হাতে নিজের

পিস্তলটা জোর করে গুঁজে দিয়ে বললে, ওহে কম্বলরামের দোস্ত কাঁথারাম, তোমারও গুলি ছোঁড়বার সাধ হয়েছে নাকি। তা হলে এটা তোমায় প্রেজেন্ট করলুম, চার আনার ক্যাপ কিনে নিয়ো—আর সারাদিন দুমফটাক করে বাড়ির কাক-টাক তাড়িয়ে।

বলে, অবলাকান্ত তো খ্যাঁ-খাঁ করে হাসলই, সেই সঙ্গে গোবরমাখা ঘেঁটুচন্দর, গাড়ির কোচোয়ান আর দুটো লণ্ঠন হাতে চারটে লোক সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। আর সেই হাসির আওয়াজে পাশের একটা ঝুপসি-মতন আমগাছ থেকে গোটা দু-তিন বাদুড় ঝটপট করে উড়ে পালাল।

ঘেঁটু বললে, কই হে কম্বলরাম, গুলি ছুঁড়লে না?

টেনিদা কিছুক্ষণ ঘুগনিদানার মতো মুখ করে চেয়ে রইল, তারপর খেলনা পিস্তলটা তার হাত থেকে টপ করে পড়ে গেল। ইস ইস—আমরা কী গাড়ল। দুটো লোক আমাদের স্রেফ বোকা বানিয়ে গড়ের মাঠ থেকে ভর সন্ধেবেলায় এমন করে ধরে আনল। আগে জানলে–

কিন্তু পিস্তল-ফিস্তল চুলোয় যাক—এখন আর কিছুই করবার নেই। আমরা দুজন—কোচোয়ান সুষ্ঠু ওরা সাতজন। টেনিদার কুস্তির প্যাঁচ-ট্যাঁচ কোনও কাজে লাগবে

—সোজা চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যাবে। সেই হেঁড়ে গলার লোকটা বললে, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর কতক্ষণ ভ্যারেণ্ডা ভাজবে, হে। রাত তো প্রায় আটটা বাজল। চলোচলো শিগগির। সিন্ধুঘোটক তখন থেকে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে।

টেনিদা একবার আমার দিকে তাকাল, আমি টেনিদার দিকে তাকালুম। তারপর কী আর করা যায়—দুজনে সুড়সুড় করে এগিয়ে চললুম লোকগুলোর সঙ্গে সঙ্গে।

কোন আদ্যিকালের একটা রদ্দিমাকা বাড়ি—মানুষজন বিশেষ থাকে-টাকে বলে মনে হল না। ভাঙাচোরা সব ঘর—কোথাও একটা তেপায়া কিংবা খাটিয়া, কোথাও

বা দু-একখানা ধুলোবালি-মাথা টেবিল-চেয়ার। দুটো লণ্ঠনের আলোয় ঘরগুলোকে যেমন বিচ্ছিরি, তেমনি ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল। থেকে থেকে মাথার ওপর দিয়ে চামচিকে উঠে যাচ্ছিল, তাই দেখে আমি শক্ত করে নিজের কান দুটোকে হাত চাপা দিলুম। চামচিকেকে আমার ভীষণ সন্দেহজনক মনে হয়—কেন যে হঠাৎ লোকের ঘরে ঢুকে ফরফর করে উড়তে থাকে তার কোনও মানেই বোঝা যায় না। ছোড়দি বলে, ওরা নাকি লোকের কান ধরে ঝুলে পড়তে ভীষণ ভালোবাসে। আমার লম্বা লম্বা কান দুটো তাই আগে থেকেই সামলে রাখাটা বুদ্ধিমানের কাজ বলেই মনে হল আমার।

এ-ঘর থেকে ও-ঘর, ও-ঘর থেকে সে-ঘর। তারপরেই ঘরটাই বোধহয় শ্রীঘর। ভেবেই আমার মনে হল, শ্রীঘর তো থানার হাজতকে বলে। সিন্ধুঘোটক নিশ্চয় পুলিশ নয় যে আমাদের দুম করে হাজতে পুরে দেবে।

এদিকে একটা সিঁড়ি বেয়ে আমরা ওপরে উঠছি। খুব বাজে মাকা সিঁড়ি, রেলিং ভাঙা, ধাপগুলো দাঁত বের করে রয়েছে। ঠিক এমনকি একটা বাড়িতেই যত রকম ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয়—দসর্দার চিং চুং বেপরোয়া গোয়েন্দা দিগ্বিজয় রায়কে গুম করে ফেলে, কিংবা কাঞ্চীগড়ের রাজরানী মৃদুলাসুন্দরীর হীরের নেকলেস নিয়ে গুণ্ডা তিলালের সঙ্গে ওস্তাদ কলিমুদ্দির গজকচ্ছপের যুদ্ধ বেধে যায়। আমার প্রিয় লেখক কুণ্ডু মশাইয়েরও যত সব দুর্ধর্ষ রোমাঞ্চকর কাহিনী একে-একে আমার মনে পড়ে যেতে লাগল।

কিন্তু খালি একটা খটকা লাগছে। সেসব গল্পে খেলনা পিস্তলের কথা কোনও দিন পড়িনি!

আবার এসব দারুণ দারুণ ভাবনায় হঠাৎ বাধা পড়ে গেল। সিঁড়ি পেরিয়েই সামনে মস্ত একটা ঘর। তার দরজাটা ভেজানো, কিন্তু ভেতর থেকে একটা জোরালো আলো বাইরে এসে পড়েছে। আমরা সেইখানে থেমে দাঁড়ালাম।

অবলাকান্ত বেশ মিহি গলায় ডাকল : স্যার!

সূচিপত্র

ভেতর থেকে ব্যাঙের ডাকের মতো আওয়াজ এল : কে?

—আমরা সবাই। মানে কম্বলরাম সুদ্ধ এসে গেছে।

—এসে গেছে? অলরাইট! ভেতরে চলে এসো।

অবলাকান্ত দরজাটা খুলে ফেলল। আর পেছন থেকে লোকগুলো আমাকে আর টেনিদাকে ধাক্কা দিয়ে বললে, যাও–যাও, এবার স্যারের সঙ্গে মোকাবেলা করো।

সবাই আমরা ঘরে পা দিলুম।

বাড়িটা নীচে থেকেই যতই খারাপ মনে হোক—এ-ঘরটা একেবারে আলাদা। টিমটিমে লণ্ঠন নয়—মেঝেতে সোঁ-সোঁ করে একটা পেট্রোম্যাক্স বাতি জ্বলছে। মস্ত ফরাসের ওপর ধপধপে শাদা চাদর বিছানো, সেখানে তিন-চারটে তাকিয়া, আর একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে—গড়গড়ার নল মুখে পুরে-

কে?

কে আর হতে পারে—সিন্ধুঘোটক ছাড়া?

চেহারা বটে একখানা! হঠাৎ দেখলে মনে হয় বোধহয় স্বপ্ন দেখছি, নিজের কানে চিমটি কেটে পরখ করতে ইচ্ছে করে। একটা লোক যে এমন মোটা হতে পারে, এক পিপে আলকাতরায় ডুব দিয়ে উঠে আসার মতো তার যে গায়ের রঙ হতে পারে, মন চারেক শরীরের ওপর এত ছোট যে একটা মাথা থাকতে পারে, আর ছোট মাথায় যে আরও ছোট এমন দুটো কুঁতকুঁতে চোখ থাকতে পারে—এ না দেখলে তবুও বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু দেখলে আর কিছুতেই বিশ্বাস করবার জো নেই।

আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলুম, ডি-লা-গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস–কিন্তু সামলে নিলুম আর সিন্ধুঘোটক ব্যাঙের গলায় গ্যাং-গ্যাং করে বললে, বোসো সব, সিট ডাউন।

এমন কায়দা করে বললে- যে, আমরা যেন সব স্কুলের ছাত্র আর হেডমাস্টার আমাদের বসতে হুকুম দিচ্ছেন।

ঘেঁটুদা কাঁউমাউ করে বললে, আমি বসতে পারব না স্যার–এই কম্বলরামটা আমাকে গোবরের ভেতরে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছে। গায়ে দারুণ গন্ধ।

সিন্ধুঘোটক বললে, তুমি একটা থার্ডক্লাস! আমার ফরাসে গোবর লাগিয়ো না– আগে চান করে এসো। যাও–গেট আউট।

ঘেঁটুদা তখুনি সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেল।

আমরা সবাই তখন ফরাসে বসে পড়েছি, সিন্ধুঘোটক তাকিয়া ছেড়ে পিঠ খাড়া করে উঠে বসল। জিজ্ঞেস করলে, কে কম্বলরাম?

অবলাকান্ত টেনিদাকে একটা খোঁচা দিয়ে বললে, এইটে।

সিন্ধুঘোটক আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, আর রোগা চিমটে খাড়া খাড়া কানওলা ওটা কে?

অবলাকান্ত বললে, নাম জানিনে স্যার। কম্বলরামের দোস্ত–কাঁথারাম বোধ হয়।

হেঁড়ে গলায় লোকটা বললে, শতরঞ্চিরাম হতেও বাধা নেই।

বাকি সবাই একসঙ্গে বললে, হ্যাঁ, শতরঞ্চিরামও হওয়া সম্ভব।

www.bengaliebook.com

সিন্ধুঘোটক বললে, অর্ডার- অর্ডার বলেই আবার গড়গড়ার নলটা মুখে তুলে নিলে। আর এইবার আমি লক্ষ করে দেখলুম, গড়গড়ায় কলকে-টলকে কিছু নেই, শুধু-শুধু একটা নল মুখে পুরে সিন্ধুঘোটক বসে আছে।

–তারপর কম্বলরাম–

এতক্ষণ টেনিদা আলু-চচ্চড়ির মতো মুখ করে বসে ছিল, এবার গাঁ-গাঁ করে উঠল।

–দেখুন স্যার, এরা গোড়া থেকেই ভুল করেছে। আমি তো কম্বলরাম নই-ই, আমাদের সাতপুরুষের মধ্যে কেউ কম্বলরাম নেই। আমি হচ্ছি টেনি শর্মা-ওরফে ভজহরি মুখুজ্যে, আর এ হল প্যালারাম–ওর ভালো নাম স্বর্ণেন্দু ব্যানার্জি। আমরা পটলডাঙায় থাকি। গরমের জ্বালায় অস্থির হয়ে আমরা গঙ্গার স্নিগ্ধ সমীর সেবন করছিলুম, আপনার ঘেঁটুচন্দর আর অবলাকান্ত গিয়ে আমাদের জোর করে ধরে এনেছে।

শুনে, সিন্ধুঘোটকের মুখ থেকে টপ করে নলটা পড়ে গেল। তিনটে কোলা ব্যাঙের ডাক একসঙ্গে গলায় মিশিয়ে সিন্ধুঘোটক প্রায় হাহাকার করে উঠল : ওহে অবলাকান্ত, এরা কী বলে?

অবলাকান্ত ব্যস্ত হয়ে বললে, বাজে কথা বলছে, স্যার। এই কম্বলরামটা দারুণ খলিফা–তখন থেকে আমাদের সমানে ভোগাচ্ছে। আপনিই ভালো করে দেখুন না, স্যার। কম্বলরাম ছাড়া এমন চেহারা কারও হয়? এমন লম্বা তাগড়াই চেহারা, এমন একখানা মৈনাকের মতো খাড়া নাক, এমনি তোবড়ানো চোয়াল–

দাঁড়াও–দাঁড়াও!–সিন্ধুঘোটক হঠাৎ তার ছোট্ট মাথা আর কুঁতকুঁতে চোখ দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলে : কিন্তু কম্বলরামের নাকের পাশে যে একটা কালো জড়ুল ছিল, সেটা কোথায়?

সঙ্গে সঙ্গে বাকি লোকগুলো সবাই ঝুঁকে পড়ল টেনিদার মুখের ওপর : তাই তো, জড়লটা কোথায়?

টেনিদা খ্যাঁচম্যাচ করে বললে, আমি কি কম্বলরাম যে জড়ল থাকবে? এইবার আপনারাই বলুন তো মশাই, এই দারুণ গ্রীষ্মের সন্ধেবেলায় খামকা দুটো ভদ্র সন্তানকে হয়রান করে আপনাদের কী লাভ হল?

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর সিন্ধুঘোটক ডাকল : অবলাকান্ত!

-বলুন স্যার!

—এটা কী হল?

—আজ্ঞে, অন্ধকার স্যার ভালো করে ঠাওর পাইনি। মাথা চুলকোতেকুলকোতে অবলাকান্ত বললে, কিন্তু আমার মনে হয় স্যার, এটাই কম্বলরাম। চালাকি করে জড়লটাও কোথাও লুকিয়ে রেখেছে।

-শাট আপ। জড়ল কি একটা মার্বেল যে ফস করে লুকিয়ে ফেলা যায়?

—যদি অপারেশন করায়?

—হুঁ। সে একটা কথা বটে—সিন্ধুঘোটক আবার নলটা তুলে নিলে : কিন্তু অপারেশনের দাগ তো থাকবে।

-নাও থাকতে পারে স্যার। আজকাল ডাক্তারদের অসাধ্য কাজ নেই।

টেনিদা কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দোরগোড়া থেকে কোচোয়ান বললে, হুজুর, আমার একটা নিবেদন আছে।

-বলে ফেলো পাঁচকড়ি। আউট উইথ ইট।

–কম্বলরামকে আমি চিনি, স্যার। রোজ বিকেলে মনুমেন্টের নীচে আমরা খইনি খাই। সে কলকাতায় নেই, আজ দুপুরবেলায় রেলে চেপে তার মামাবাড়ি বাঁকুড়া চলে গেছে।

শুনে, অবলাকান্ত তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। পাঁচকড়িকে এই মারে তো সেই মারে।

—তবে এতক্ষণ বলিসনি কেন হতভাগা বুদ্ধ কোথাকার? খামকা আমাদের খাটিয়ে মারলি?

–বলে কী হবে? আমার কথা তো কেউ বিশ্বাস করে না বলে, ভারি নিশ্চিন্ত মনে পাঁচকড়ি হাতের মুঠোয় খইনি ডলতে লাগল আর গুনগুনিয়ে গান ধরল : বনে চলে সিয়ারাম, পিছে লছমন ভাই

সিন্ধুঘোটক বললে, অর্ডার, অর্ডার! পাঁচকড়ি, নো সিংগিং নাউ। কিন্তু এ-পরিস্থিতিতে কী করা যায়?

অবলাকান্ত প্যাঁচার মতো মুখ করে বসে রইল। আর বাকি সবাই একসঙ্গে বললে, তাই তো, কী করা যায়!

টেনিদা বললে, কিছুই করবার দরকার নেই স্যার। বেশ রাত হয়েছে, আমাদের তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিন, নইলে বাড়িতে গিয়ে বকুনি খেতে হবে।

সিন্ধুঘোটক কিছুক্ষণ খালি খালি গড়গড়া টানতে লাগল। কলকে-টলকে কিছু নেই, শুধু গড়গড়ার ভেতর থেকে উঠতে লাগল জলের গুড়গুড় আওয়াজ।

তারপর সিন্ধুঘোটক বললে, হয়েছে।

অবলাকান্ত ছাড়া বাকি সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, কী হয়েছে!

–প্ল্যান। কম্বলরাম যখন নেই, তখন একে দিয়েই কাজ চালাতে হবে। নাকের নীচে একটা জড়ুল বসিয়ে দিলেই ব্যস–কেউ আর চিনতে পারবে না।

অবলাকান্ত ভারি খুশি হয়ে হাত কচলাতে লাগল : আমিও তো স্যার সেই কথাই বলছিলুম।

হায়-হায়, ঘাটে এসে শেষে নৌকো ডুবল! এতক্ষণ বেশ আরাম বোধ করছিলাম, কিন্তু সিন্ধুঘোটকের কথায় একেবারে ধুক করে নিবে গেল বুকভরা আশা। টেনিদার দিকে চেয়ে দেখলুম, ওর মুখখানা যেন ফজলি আমের মতো লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে।

টেনিদা শেষ চেষ্টা করল : স্যার, আমাদের আর মিথ্যে হ্যারাস করবেন না। ভুল যখন বুঝেইছেন–

সিন্ধুঘোটক এবার কুঁতকুঁতে চোখ মেলে টেনিদার দিকে তাকিয়ে রইল খানিকটা। কী ভেবে মিনিট খানেক খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসল, তারপর বললে, আচ্ছা ছোরারা, তোমরা আমাদের কী ভেবেছ বলো দেখি? রাক্ষস? খপ করে খেয়ে ফেলব?

ভাবলে অন্যায় হয় না–অন্তত সিন্ধুঘোটকের চেহারা দেখলে সেই রকমই সন্দেহ হয়। এতক্ষণে আমি বললুম, আমরা কিছুই ভাবছি না স্যার, কিন্তু বাড়ি ফিরতে আর দেরি হলে বড়দা আমার কান ধরে-

-হ্যাং ইয়োর বড়দা!-বিরক্ত হয়ে বললে, তোমার কান দুটো এমনিতেই বেশ বড় রয়েছে, একটু ছাঁটাই করে দিলে নেহাত মন্দ হবে না। ওসব বাজে কথা রাখো। তোমাদের দিয়ে আজ রাতে আমরা একটা মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চাই। যদি সফল হইতোমাদের খুশি করে রিওয়ার্ড দেব!

—মহৎ উদ্দেশ্য।-টেনিদা চিড়বিড় করে উঠল : এইভাবে ভদ্দর লোকদের পথ থেকে পাকড়াও করে এনে কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে স্যার?

সিন্ধঘোটক চটে বললে, চোপরাও! এই বাড়ির পেছনে একটা পচা ডোবা আছে, তাতে কিলবিল করছে জোঁক। বেশি চালাকি করো তো, দুজনকে আধঘণ্টা তার মধ্যে চুবিয়ে রাখব!

শুনে আমার প্রাণ শুকিয়ে গেল। জোঁক আমি কখনও দেখিনি, কিন্তু তারা কী করে কুটুস করে মানুষকে কামড়ে ধরে আর নিঃশব্দে রক্ত শুষে খায়, তার ভয়াবহ বিবরণ অনেক শুনেছি। তা থেকে জানি, আর যাই হোক, জোঁকের সঙ্গে কখনও জোক চলে না।

টেনিদা হাঁউমাউ করে বললে, না স্যার, জোঁক নয়, জোঁক নয়! ওরা খুব বাজে জিনিস।

—তা হলে আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাও।

-কী করতে হবে, স্যার?

—বেশি কিছু নয়। শুধু একজনের পকেট থেকে একটা কৌটো তুলে আনতে হবে। আর সেকাজ কম্বলরাম ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না।

-কীসের কৌটো স্যার?

—জারমান সিলভারের।

-কী আছে তাতে?—টেনিদা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল : হীরে-মুক্তা-মানিক? কোহিনুর? নাকি আরও, আরও দামী, আরও দুর্মূল্য কোনও দুর্লভ রত্ন?

সিন্ধুঘোটক গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে নামিয়ে কিছুক্ষণ প্যাট-প্যাট করে চেয়ে রইল। তারপর বিষম বিরক্ত হয়ে বললে, ধেৎ, হীরে-মুক্তো কোত্থেকে আসবে? অত সস্তা নাকি?

-তবে কী আছে স্যার? কোনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গোপন ফরমুলা?

-নাঃ ও-সব কিছু নয়!—চিরতা-খাওয়ার মতো তেতো মুখ করে সিন্ধুঘোটক বললে, কৌটোয় কী আছে, জানো? নস্যি, এক নম্বরের কড়া নস্যি। তার দাম দু-পয়সা কিংবা চার পয়সা!

—অ্যাঃ! সেই কৌটোর জন্যে—

সিন্ধুঘোট বললে, শাট আপ! এর বেশি আর জানতে চেয়ো না এখন। ওহে অবলাকান্ত, এই নকল কম্বলরামকে এবার নিয়ে যাও-কাঁথারামকেও ছেড়ো না। মেক-আপ করে দশ মিনিটের মধ্যে রেডি করে ফেলল।

আর একবার মনে হল, জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখছি? তক্ষুনি নিজের গায়ে চিমটি কেটে আমি চমকে উঠলুম, আর কে যেন আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললে, চলো ব্রাদার—আর দেরি নয়।

যেতে হল পাশের একটা ছোট ঘরে

যেতে হল পাশের একটা ছোট ঘরে।

সঙ্গে এল অবলাকান্ত, পাঁচকড়ি কোচম্যান আর হেঁড়ে গলার সেই লোকটা। দেখলুম ঘরে একটা আয়না রয়েছে, আর থিয়েটারের সময়ে যে-সব রং-টং মাখে তা-ও রয়েছে একগাদা। এমন কি, কয়েকটা পরচুলো, নকল গোঁফ, এসবও আমি দেখতে পেলুম।

কিন্তু মানে কী এসবের?

টেনিদা বললে, আপনারা কী চান স্যার? মতলব কী আপনাদের?

—আমাদের মতলব তো সিন্ধুঘোটকের কাছ থেকেই শুনেছ।—সেই হেঁড়ে গলার লোকটা ফস করে টেনিদার মুখে আঠার মতো কী খানিকটা মাখিয়ে দিয়ে বললে, একটা নস্যির কৌটো পাচার করতে হবে।

–কার নস্যির কৌটো?

—বিজয়কুমার?

–নামজাদা ফিল্মস্টার বিজয়কুমার।

অভিনেতা বিজয়কুমার। শুনে আমি একটা খাবি খেলুম। কী সর্বনাশ—তিনি যে একজন নিদারুণ লোক! তাঁর কত ফিল্ম দেখতে-দেখতে আমার মাথার চুল স্রেফ আলপিনের মতো খাড়া হয়ে উঠেছে। ভদ্রলোকের অসাধ্য কাজ নেই। এই সুন্দরবনের জঙ্গলে ধড়াম-ধড়াম করে দুটো বাঘ আর তিনটে কুমির মেরে ফেললেন, এই একটা মোটরবাইকে চড়ে পাঁইপাঁই করে অ্যাঁয়সা ছুট লাগালেন যে, দুরন্ত দস্যুদল ঝড়ের বেগে মোটর ছুটিয়েও তাঁকে ধরতে পারলে না। কখনওবা দারুণ বৃষ্টির ভেতরে বনের মধ্যে দিয়ে যেতে-যেতে করুণ সুরে গান গাইতে

লাগলেন। (অত বৃষ্টিতে ভিজেও ওঁর সর্দি হয় না, আর কী জোরালো গলায় গান গাইতে পারেন)। আবার কখনওবা ভারি নরম গলায় কী সব বলতে বলতে, হলসুদ্ধ সবাইকে কাঁদিয়ে-টাঁদিয়ে ফস করে চলে গেলেন। মানে, ভদ্রলোক কী যে পারেন না, তাই-ই আমার জানা নেই!

এহেন বিজয়কুমারের নস্যির কৌটো লোপাট করতে হবে। সেই কৌটোর দাম বড়োজোর আট আনা, তাতে খুব বেশি হলে দু আনার কড়া নস্যি। হীরে নয়, মুক্তো নয়, সোনা-দানা নয়, ঘোরতর দস্যু ডাক্তার ক্যাডাভ্যারাসের দুরন্ত মারণ রশ্মির রহস্যও নয়। এরই জন্যে এত কাণ্ড! কোত্থেকে এক বিদঘুটে সিন্ধুঘোটক, সন্ধ্যোবেলায় গড়ের মাঠে দুটো বিটকেল লোক—অবলাকান্ত আর ঘেঁটুদা—দুটো খেলনা পিস্তল নিয়ে হাজির, একটা লক্কর ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে আমাদের লোপাট করা, ভুতুড়ে পোড় বাড়ি, টেনিদাকে কম্বলরাম আর আমাকে কাঁথারাম সাজানো। এসব ধাষ্ট্যামোর মানে কী?

লোকগুলো ফসফস করে আঠাফাটা দিয়ে আমার মুখে খানিকটা যাচ্ছেতাই গোঁফ দাড়ি লাগিয়ে দিলে, তা থেকে আবার শুটকো চামচিকের মতো কী রকম যেন বিচ্ছিরি গন্ধ আসছিল। আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজের চেহারা দেখে আমার তাক লেগে গেল—ঠিক আমাদের পাড়ার ন্যাদাপাগলার মতো দেখাচ্ছে—যে-লোকটা হাঁটু অবধি একটা খাকি শার্ট ঝুলিয়ে, গলায় ছেড়া জুতোর মালা পরে, হাতে একটা ভাঙা লাঠি নিয়ে মাঝে মাঝে রাস্তায় ট্র্যাফিক কন্ট্রোল করতে চেষ্টা করে। আর টেনিদার মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা তিন-চারদিনের না-কামানো দাড়ি, নাকের পাশে ইয়া বড়া এক কটকটে জড়ুল।

আমি কাঁথারাম কিংবা ন্যাদাপাগলা যাই হই, টেনিদা যে মোম একটি কম্বলরাম, তাতে আমার আর এতটুকু সন্দেহ রইল না। এমন কি, একথাও মনে হতে লাগল যে, আসলে টেনিদা ছদ্মবেশী কম্বলরাম ছাড়া আর কিছুই নয়! কিন্তু সব মিলিয়ে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে? এসব সাজগোজ করে আমরা যাব কোথায়, আর এই

রাতে? এই পোড়ড়াবাড়িতে, ফিল্মস্টার বিজয়কুমারের পকেটটাই বা পাওয়া যাবে কোথায় যে, আমরা ফস করে তা থেকে নস্যির কৌটো লোপাট করে দেব?

আমি মুখ কাঁচুমাচু করে বললুম, বিজয়কুমার কোথায় আছেন স্যার?

যে-লোকটা আমার মুখে দাড়ি গোঁফ লাগাচ্ছিল, সে বললে, আছে কাছাকাছি কোথাও। সময় হলেই জানতে পারবে।

কিন্তু তাঁর পকেট মারবার জন্যে আমাদের ধরে আনা কেন?—টেনিদা গোঁ-গোঁ করে বললে, আমরা ওসব কাজ কোনওদিন করিনি। আমরা ভালো ছেলে কলেজে পড়ি।

আর একজন বললে, থামো হে কম্বলরাম, বেশি ফটফট কোরো না। তোমার গুণের কথা কে জানে না, তাই শুনি? বলি, বিজয়কুমারের খাস চাকর হিসেবে তার পকেট থেকে রোজ পয়সা হাতাওনি তুমি? দুবার সে তোমায় বলেনি,—এই ব্যাটা কম্বল, তোর জ্বালায় আমি আর পারি না তুই আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা? নেহাত কান্নাকাটি করেছিলে বলে আর তোমার রান্না মোগলাইকারী না হলে বিজয়কুমারের খাওয়া হয় না বলেই তোমার চাকরিটা থেকে যায়নি? তুমি বলতে চাও, এগুলো সব মিথ্যে কথা?

টেনিদা ঘোঁতঘোঁত করে বললে, কেন বারবার বাজে কথা বলছেন? আমি কম্বলরাম নই।

—এতক্ষণ ছিলে না। কিন্তু এখন আর সে কথা বলবার জো নেই। শ্রীমান কম্বলরাম নিজে সামনে এসে দাঁড়ালেও এখন ফয়সালা করা শক্ত হবে—কে আসল আর কে নকল! বুঝলে ছোকরা, আমার হাতের কাজই আলাদা। টালা থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত যত থিয়েটার হয়, তাদের কোনও মেক-আপ ম্যান আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। তোমাকে যা সাজিয়েছি না,—চোখ থাকলে তার কদর বুঝতে।

–কদর বুঝে আর দরকার নেই। এখন বলুন, আমাদের এই সং সাজিয়ে আপনাদের কী লাভ হচ্ছে।

–এত কষ্ট করে তোমাকে কম্বলরাম বানালুম, আর তুমি বলছ সং!-লোকটা ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল : মনে ভারি ব্যথা পেলুম হে ছোকরা, ভারি ব্যথা পেলুম। নাও, চলো এখন সিন্ধুঘোটকের কাছে। তিনিই বলে দেবেন, কী করতে হবে।

আবার সুড়সুড় করে দোতলায় যেতে হল আমাদের। কথা বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই–সে তো বোঝাই যাচ্ছে। শুধু এইটেই বোঝা যাচ্ছে না যে, বিজয়কুমারের পকেট হাতড়াবার জন্যে আমাদের ধরে আনা কেন? ও তো সিন্ধুঘোটকের দলের যে কেউ করতে পারত–লোকগুলোকে দেখলেই ছ্যাঁচড়া আর গাঁটকাটা বলে সন্দেহ হয়।

তা ছাড়া পকেট মারতে গিয়ে যদি ধরা পড়ি–

ধরা পড়লে কী হবে তা অবিশ্যি বলবার দরকার নেই। তখন রাস্তাসুদু লোক একেবারে পাইকারী হারে কিলোতে আরম্ভ করবে। হিতোপদেশের সেই কীলোৎপাটীত বানরঃ–অর্থাৎ কিনা কিলের চোটে দাঁতের পাটি-ফাটি সব উপড়ে যাবে আমাদের।

কিন্তু কাজটা বোধহয় টেনিদা–ওরফে কম্বলরামকেই করতে হবে, কাজেই কিলচড় আমার বরাতে না-ও জুটতে পারে। তা ছাড়া টেনিদার ঠ্যাং দুটোও বেশ লম্বা-লম্বা। বেগতিক বুঝলে তিনলাফে এক মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে পারে। দেখাই যাক না-কী হয়।

আর সত্যি বলতে কী, এতক্ষণে আমারও কেমন একটা উত্তেজনা হচ্ছিল। কলকাতায় এই দারুণ গরম–চটচটে ঘাম আর রাত্তিরে বিচ্ছিরি গুমোট–সব মিলে মন-মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এমন কি, গঙ্গার ধারের শীতল সমীরেও

www.bengaliebook.com

যে খুব আরাম হচ্ছিল তা নয়। তারপরেই ঘেটুদা আর অবলাকান্ত এসে হাজির। দিব্যি জমে উঠেছিল, বিরাট একটা সিন্ধুঘোটক ছিল, বেশ একটা ভীষণ রকমের কিছু রোমাঞ্চকর ব্যাপার ঘটবে এমনি মনে হচ্ছিল, কিন্তু একটা নস্যির কৌটোতেই সব গোলমাল করে দিচ্ছে। একটা হীরে-মুক্তো হলেও ব্যাপারটা কিছু বোঝা যেত, কিন্তু–

সিন্ধুঘোটক সমানে গড়গড়া টানছে–আশ্চর্য, কলকে যে নেই সেটা কি ওর খেয়ালই হয় না? নাকি, বিনা কলকেতেই গড়গড়া খাওয়াই ওর অভ্যেস। কে জানে!

আমরা ঘরে যেতেই সিন্ধুঘোটক কটমট করে তাকাল আমার দিকে।

–এটা আবার কে? কোন পাগলাগারদ থেকে একে ধরে আনলে?

–আজ্ঞে, পাগলাগারদের আসামী নয়, ও কাঁথারাম।

–ওটাকে সাজাতে গেলে কেন?

–এমনি একটু হাতমক্‌শ করলুম, আজ্ঞে যে আমার মুখে বাল্লু গোঁফদাড়ি লাগিয়ে দিয়েছিল, সে একগাল হেসে জবাব দিলে।

–কম্বলরামটা খাসা হয়েছে। হাঁ–নিখুঁত।–সিন্ধুঘোটক গড়াগড়া রেখে উঠে দাঁড়াল, তারপর এগিয়ে এল আমাদের দিকে। ঠিক যেন শুড়কাটা একটা হাতি দু পায়ে এগিয়ে এল দুলতে-দুলতে।

প্রথমেই টেনিদার নাকটা নেড়েচেড়ে দেখল, তারপর আঙুল নিয়ে জড়লটা পরখ করল, তারপর একটা কান ধরে একটু টানল। টেনিদার মুখটা রাগের চোটে ঠিক একটা বেগুনের মতো হয়ে যাচ্ছিল–এ আমি পষ্ট দেখতে পেলাম। কিন্তু কিছু করবার জো নেই–অনেকগুলো লোক রয়েছে চারপাশে, টেনিদা শুধু গোঁ-গোঁ করতে লাগল।

–কান ধরছেন কেন, স্যার?

–কেন, অপমান হল নাকি?–সিন্ধুঘোটক একরাশ দাঁত বের করে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে উঠল : ওহে, মজার কথা শুনেছ? কম্বলরামের অপমান হচ্ছে।

ঘরসুদ্ধ লোক অমনি একসঙ্গে ঘোঁকঘোঁক করে হেসে উঠল। সব চাইতে বেশি করে হাসল ঘেঁটুদা, টেনিদা যাকে ল্যাং মেরে গোবরের ভেতর ফেলে দিয়েছিল।

হাসি থামলে সিন্ধুঘোটক বললে, যাক–আর সময় নষ্ট করে দরকার নেই। এবার অ্যাঁকশন।

–অ্যাঁকশন!–শুনেই আমার পিলে-টিলে কেমন চমকে উঠল, আমি টেনিদার দিকে। চাইলাম। দেখলুম, খাঁড়ার মতো নাকটা যেন অনেকখানি খাড়া হয়ে উঠেছে, রাগে চোখ দুটো দিয়ে আগুন ছুটছে।

সেই বাড়ি থেকে

সেই বাড়ি থেকে আমরা বেরিয়ে পড়লুম আবার। এবার ঘোড়ার গাড়িতে নয়, স্রেফ পায়দলে। আমাদের ঘিরে ঘিরে চলল আরও জনাসাতেক লোক।

রাস্তাটা এবড়ো-খেবড়ো—দূরে দূরে মিটমিটিয়ে আলো জ্বলছে। পথের ধারে কাঁচা ড্রেন, কচুরিপানা, ঝোপজঙ্গল, কতকগুলো ছাড়া-ছাড়া বাড়ি, কয়েকটা ঠেলাগাড়িও পড়ে আছে। এদিকে-ওদিকে। দুজন লোক আসছিল—ভাবলুম চেঁচিয়ে উঠি, কিন্তু তক্ষুনি আমার কানের কাছে কে যেন ফ্যাঁসফাঁস করে বন-বেড়ালের মতো বললে, এই ছোকরা, একেবারে স্পিকটি নট। চেঁচিয়েছিস কি তক্ষুনি মরেছিস, এবার খেলনা পিস্তল নয়—সঙ্গে ছোরা আছে!

লোক দুটো বোধ হয় কুলি-টুলি হবে, যেতে-যেতে কটমটিয়ে কয়েকবার চেয়ে দেখল আমাদের দিকে। আমি প্রায় ভাঙা গলায় বলতে যাচ্ছিলুম—বাঁচাও ভাই সব কিন্তু ছোরার ভয়ে নিজের আর্তনাদটা কোঁত করে গিলে ফেলতে হল।

এর মধ্যে টেনিদা একবার আমার হাতে চিমটি কাটল। যেন বলতে চাইল, এই চুপ করে থাক!

হঠাৎ লোকগুলো আর-একটা ছোট রাস্তার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। একজন সেই রাস্তা ব্রাবর আঙুল বাড়িয়ে বললে, দেখতে পাচ্ছ?

আমরা দেখতে পেলুম।

রাস্তাটা বেশি দূর যায়নি—দুপাশে কয়েকটা ঘুমিয়ে-পড়া টিনের ঘর রেখে আন্দাজ দুশো গজ দূরে গিয়ে থমকে গেছে। সেখানে একটা মস্তবড় লোহার ফটক, তাতে জোরালো ইলেকট্রিক লাইট জ্বলছে আর ফটকের মাথার ওপর লেখা রয়েছে : জয় মা তারা স্টুডিয়ো।

সূচিপত্র

ঘেঁটুদা বললে, চলে যাও–ওইখানেই তোমাদের কাজ। এই কাঁথারামকেও সঙ্গে নিয়োনস্যির কৌটোটা বিজয়কুমারের পকেট থেকে লোপাট করে এর হাতে দেবে, তারপর যেমন গিয়েছিলে–সুট করে বেরিয়ে আসবে। ব্যস, তা হলেই কাজ হাসিল। তারপরেই তোমাদের হাত ভরে প্রাইজ দেবে সিন্ধুঘোটক।

–কিন্তু একটা নস্যির কৌটোর জন্যে আমি গজগজ করে উঠলুম।

-নিশ্চয় নিদারুণ রহস্য আছে–ঘেঁটুদা আবার বললে- : কিন্তু তা জেনে তোমাদের কোনও দরকার নেই। এখন যা বলছি, তাই করো। সাবধান স্টুডিয়োর ভেতরে গিয়ে যদি কোনও কথা ফাঁস করে দাও, কিংবা পালাতে চেষ্টা করে, তা হলে কিন্তু নিদারুণ বিপদে পড়বে। সিন্ধুঘোটকের নজরে পড়লে একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত লুকিয়ে বাঁচতে পারে না, সেটা খেয়াল রেখো।

টেনিদা বললে, খেয়াল থাকবে।

ঘেঁটুদা আবার বললে, আমরা সব এখানেই রইলুম। গেটের দারোয়ান বিজয়কুমারের পেয়ারের চাকর কম্বলরামকে চেনেতোমাকে বাধা দেবে না। আর তুমি কাঁথারামকেও নিজের ভাই বলে চালিয়ে দেবে। গেট দিয়ে ঢুকে একটু এগিয়েই দেখবে গুদামের মতো প্রকাণ্ড একটা টিনের ঘর–তার উপর লেখা রয়েছে ইংরিজিতে ২। ওটাই হচ্ছে দু নম্বর ফ্লোর, ওখানেই বিজয়কুমারের শুটিং হচ্ছে।

–ফ্লোর! শুটিং! এ সব আবার কী ব্যাপার?–টেনিদা ঘাবড়ে গিয়ে জানতে চাইল : ওখানে আবার গুলিগোলার কোনও ব্যাপার আছে নাকি?

–আরে না–না, ও সমস্ত কোনও ঝামেলা নেই। বললুম তো ফ্লোর হচ্ছে গুদামের মতো একরকমের ঘর, ওখানে নানারকম দৃশ্য-শ্য তৈরি করে সেখানে ফিল্ম তোলা হয়। আর শুটিং হল গিয়ে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলাকাউকে গুলি করার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই!

–বুঝতে পারলুম। আচ্ছা–দু নম্বর ফ্লোরে না হয় গেলুম-সেখানে না হয় দেখলুম, বিজয়কুমারের শুটিং হচ্ছে–তখন কী করব?

সুযোগ বুঝে তার কাছে গুটি গুটি এগিয়ে যাবে। সে হয়তো জিজ্ঞেস করবে, কী রে কম্বুলে, দেশে গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে চলে এলি যে? আর স্টুডিয়োতেই বা এলি কেন? উত্তরে তুমি বলবে, কী করব স্যার–দেশের বাড়িতে গিয়েই আপনার সম্পর্কে একটা খারাপ স্বপ্ন দেখলুম-মেজাজ খিঁচড়ে গেল এজ্ঞে, তাই চলে এলুম। শুনলুম আপনি স্টুডিয়োতে এয়েছেন, তাই দর্শন করে চক্ষু সার্থক করে গেলুম। শুনে বিজয়কুমার হয়তো হেসে বলবে, ব্যাটা তো মহা খলিফা! বলে তোমার পিঠে চাপড়ে দেবে, আর একটা টাকা হাতে খুঁজে দিয়ে বলবে, নে–কিছু মিষ্টি-ফিষ্টি খেয়ে বাড়ি চলে যা। আমার ফিরতে রাত হবে, পারিস তো ভালো দেখে একটা মুরগি রোস্ট করে রাখিস। যখন এই সব কথা বলতে থাকবে, তখন সেই ফাঁকে তুমি চট করে তার পকেট থেকে নস্যির ডিবেটা তুলে নেবে।

–যদি ধরা পড়ে যাই?

-বলবে, পকেট মারিনি স্যার, একটা পিঁপড়ে উঠেছে, তাই ঝাড়ছিলুম।

–যদি বিশ্বেস না করে?

-অভিমান করে বলবে, স্যার, আমার কথায় অবিশ্বাস? আমি আর এ-পোড়ামুখ দেখাব –গঙ্গায় ডুবে মরব। বলতে বলতে কাঁদতে থাকবে। বিজয়কুমার বলবে কী মুস্কিলকী মুস্কিল! তখন তার পা জড়িয়ে ধরার কায়দা করে তাকে পটকে দেবে। আর ধাঁই করে যদি একবার আছাড় খায়, আর ভাবতে হবে না–তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে-বুঝেছ?

টেনিদা বললে, বুঝেছি।

–তা হলে এগোও।

www.bengaliebook.com

—এগোচ্ছি।

—খবরদার, কোনও রকম চালাকি করতে যেয়ো না, তা হলেই—

—আজ্ঞে জানি, মারা পড়ব। ঘেঁ

টুদা খুশি হয়ে বললে, শাবাশ—ঠিক আছে। এবার এগিয়ে যাও—

টেনিদা বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, এগিয়ে চললুম।

আমরা দুজনে গুটিগুটি জয় মা তারা স্টুডিয়োর দিকে চলতে লাগলুম। ওরা যে কোথায় কোনখানে ভুট করে লুকিয়ে গেল, আমরা পেছন ফিরেও আর দেখতে পেলুম না।

আমি চাপা গলায় বললুম, টেনিদা?

—হুঁ!

—এই তো সুযোগ।

টেনিদা আবার বললে, হুঁ!

—সমানে হুঁ-হুঁ করছ কী? এখন ওরা কেউ কোথাও নেই—আমরা মুক্ত—এখন একেবারে বেপরোয়া হয়ে—মানে যাকে বলে উদ্দাম উল্লাসে ছুটে পালাতে পারি এখান থেকে। ফিল্ম স্টুডিয়ো যখন রয়েছে, তখন জায়গাটা নিশ্চয় টালিগঞ্জ। আমরা যদি জয় মা তারা স্টুডিয়োতে না গিয়ে পাশের খানা-খন্দ ভেঙে এখন চোঁ-চোঁ ছুটতে থাকি, তা হলে—

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, এখন কুরুবকের মতো বকবক করিসনি প্যালা, আমি ভাবছি।

কী ভাবছ? সত্যি সত্যিই তুমি স্টুডিয়োতে ঢুকে ফিল্মস্টার বিজয়কুমারের পকেট মারবে নাকি?

-শাট আপ! এখন সামনে পুঁদিচ্চেরি!

খুব জটিল সমস্যায় পড়লে টেনিদা বরাবর ফরাসী আউড়ে থাকে। আমি বললুম, পুঁদিচ্চেরি? সে তো পণ্ডিচেরী! এখানে তুমি পণ্ডিচেরী পেলে কোথায়?

—আঃ, পণ্ডিচেরী নয়, আমি বলছিলুম, ব্যাপার অত্যন্ত ঘোরালো। বুদ্ধি করতে হবে। আমি বললুম, কখন বুদ্ধি করবে? ইদিকে আমাকে আবার এক বিতিকিচ্ছিরি পাগল। সাজিয়েছে, মুখে কিচমিচ করছে সাতরাজ্যের দাড়ি, কুটকুটুনিতে আমি তো মারা গেলুম! ওদিকে তুমি আবার চলেছ পকেট মারতে ধরা পড়লে কিলিয়ে একেবারে কাঁটাল পাকিয়ে দেবে, এখন-

-চোপ রাও।

অগত্যা চুপ করতে হল। আর আমরা একেবারে জয় মা তারা স্টুডিয়োর গেটের সামনে এসে পৌঁছলুম। ভয়ে আমার বুক দুরদুর করতে লাগল—মনে হতে লাগল, একটু পরেই একটা যাচ্ছেতাই কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে!

স্টুডিয়োর লোহার ফটক আধখোলা। পাশে দারোয়ানের ঘর আর ঘরের বাইরে খালি গায়ে এক হিন্দুস্থানী জাঁদরেল দারোয়ান বসে একমনে তার আরও জাঁদরেল গোঁফজোড়াকে

পাকিয়ে চলেছে।

টেনিদাকে দেখেই সে একগাল হেসে ফেলল!

–কেয়া ভেইয়া কম্বলরাম, সব আচ্ছা হ্যায়?

-হাঁ, সব আচ্ছা হ্যায়।

-তুমহারা সাথ ই পাগলা কৌন হে?

আমাকেই পাগল বলছে নিশ্চয়। যে-লোকটা আমাকে হাতের কাছে পেয়ে মনের সুখে মেক-আপ দিয়েছিল, তাকে আমার স্রেফ কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে করল। প্রায় বলতে যাচ্ছিলুম, হাম পাগলা নেহি হ্যায়, পটলডাঙাকা প্যালারাম হ্যায়, কিন্তু টেনিদার একটা চিমটি খেয়েই আমি থেমে গেলুম।

টেনিদা বললে, ই পাগলা নাহি হ্যায়-ই হ্যায় আমার ছোট ভাই কাঁথারাম।

-কাঁথারাম?–দারোয়ান হাঁ করে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে বললে, রাম–রাম-সিয়ারাম! রামজী-নে দুনিয়ামে কেতনা অজীব চীজোঁকো পয়দা কিয়া। আচ্ছা–চলা যাও অন্দরমে। তুমহারা বাবু দুলম্বর মে হ্যায়–হুঁয়াই শুটিং চল রহা হ্যায়!

আমরা স্টুডিয়োর ভেতরে পা দিলুম। চারদিকে গাছপালা, ফুলের বাগান, একটা পরী-মাকা ফোয়ারাও দেখতে পেলুম–আর কত যে আলো জ্বলছে, কী বলব। দেখলুম, সব সারি-সারি গুদামের মতো উঁচু-উচু টিনের ঘর, তাদের গায়ে বড় বড় শাদা হরফে এক-দুই করে নম্বর লেখা। দেখলুম, বড় বড় মোটরভ্যানে রেডিয়োর মতো কী সব যন্ত্র নিয়ে, কানে হেডফোন লাগিয়ে কারা সব বসে আছে, আর রেডিয়োর মতো সেই যন্ত্রগুলোতে থিয়েটারের পার্ট করার মতো আওয়াজ উঠছে।

প্যান্টপরা লোকজন ব্যস্ত হয়ে এপাশ ওপাশ আসা-যাওয়া করছিল, আর মাঝে-মাঝে কেউ-কেউ তাকিয়ে দেখছিল আমার দিকেও। একজন ফস করে এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে গেল।

–বাঃ, বেশ মেকআপ হয়েছে তো! চমৎকার!

মেক আপ! ধরে ফেলেছে!

আমার বুকের রক্ত সঙ্গে সঙ্গে জল হয়ে গেল। আমি প্রায় হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু টেনিদা পটাং করে আমাকে চিমটি কাটল।

লোকটা আবার বললে, এক্সট্রা বুঝি?

এক্সট্রা তো বটেই, কম্বলরামের সঙ্গে কাঁথারাম ফাউ। আমি ক বলবার জন্যে হাঁ করেছিলুম, কিন্তু তক্ষুনি টালিগঞ্জের গোটাকয়েক ধাড়ী সাইজের মশা আমার মুখ বরাবর তাড়া করে আসাতে ফস করে মুখটা বন্ধ করে ফেলুলম।

টেনিদা বললে, হ্যাঁ, স্যার, এক্সট্রা। থিয়োরেম নয়, প্রবলেম নয়, একদম এক্সট্রা! আর এত বাজে এক্সট্রা যে বলাই যায় না।

–বা-রে কম্বলরাম, বিজয়কুমারের সঙ্গে থেকে তো খুব কথা শিখেছ দেখছি। তা এ কোন্ বইয়ের এক্সট্রা?

–আজ্ঞে জিয়োমেট্রির। থার্ড পার্টের।

লোকটা এবারে চটে গেল। বললে, দেখো কম্বলরাম, বিজয়কুমার আদর দিয়ে দিয়ে তোমার মাথাটি খেয়েছেন। তুমি আজকাল যাকে তাকে যা খুশি তাই বলো। তুমি যদি আমার চাকর হতে, তা হলে আমি তোমায় পিটিয়ে স্রেফ তক্তপোশ করে দিতুম।

বলেই হনহন করে চলে গেল সে।

আমি ভয় পেয়ে বললুম, টেনিদা-কী হচ্ছে এসব?

টেনিদা বললে, এই তো সবে রগড় জমতে শুরু হয়েছে। চল—এবার ঢোকা যাক দু নম্বর স্টুডিয়োতে।

স্টুডিয়ো মানে

স্টুডিয়ো মানে যে এমনি একখানা এলাহি কাণ্ড, কে ভেবেছিল সে-কথা।

সামনেই যেন থিয়েটারের ছোট একটা স্টেজ খাটানো রয়েছে, এমনি মনে হল। সেখানে ঘর রয়েছে, দাওয়া রয়েছে, পেছনে আবার সিনে-আঁকা দু-দুটো নারকেল গাছও উঁকি মারছে। সে সব তো ভালোই কিন্তু চারদিকে সে কী ব্যাপার। কত সব বড় বড় আলো, কত মোটা-মোটা ইলেকট্রিকের তার, বনবনিয়ে ঘোরা সব মস্তমস্ত পাখা। কজন লোক সেই দাওয়াটার ওপর আলো ফেলছে, একজন কোটপ্যান্ট পরা মোটা মতন লোক বলছে : ঠিক আছে—ঠিক আছে।

ঢুকে আমরা দুজন স্রেফ হাঁ করে চেয়ে রইলুম! সিনেমা মানে যে এইরকম গোলমেলে ব্যাপার, তা কে জানত? কিছুক্ষণ আমরা কোনও কথা বলতে পারলুম না, এককোণায় দাঁড়িয়ে ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে থাকলুম কেবল।

কোত্থেকে আর একজন গেঞ্জি আর প্যান্টপরা লোক বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠল : মনিটার।

সঙ্গে সঙ্গে মোটা লোকটা বললে, লাইটস!

তার আশপাশ থেকে, ওপর থেকে অসংখ্য সার্চলাইটের মতো আলো সেই তৈরি করা ঘরটার দাওয়ায় এসে পড়ল। মোটা লোকটা বললে, পাঁচ নম্বর কাটো।

–কার নম্বর আবার কেটে নেবে? এখানে আবার পরীক্ষা হয় নাকি—টেনিদাকে আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলুম।

টেনিদা কুট করে আমার কানে একটা চিমটি দিয়ে ফ্যাসফ্যাস করে বললে, চুপ করে থাক।

মোটা লোকটা আবার চেঁচিয়ে বললে, কেটেছ পাঁচ নম্বর?

একটা উঁচুমতন জায়গা থেকে কে যেন একটা আলোর ওপর একটুকরো পিচবোর্ড ধরে বললে, কেটেছি।

গেঞ্জি আর প্যান্টপরা লোকটা আবার বাজখাঁই গলায় বললে, ডায়লগ।

আমাদের পাশ থেকে হাওয়াই শার্ট আর পাজামা পরা বেঁটেমতন একজন লোক মোটা একটা খাতা বগলদাবা করে এগিয়ে গেল। আর তখুনি আমরা রোমাঞ্চিত হয়ে দেখলুম-কোত্থেকে সুট করে আলোর মধ্যে এসে দাঁড়ালেনআর কেউ নয়, স্বয়ং বিজয়কুমার। তাঁর পরনে হলদে জামা-হলুদ কাপড়—যেন ছট পরব সেরে চলে এসেছেন।

সেই বিজয়কুমার! যিনি ঝপাং করে নদীর পুল থেকে জলে লাফিয়ে পড়েনচলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে উধাও হয়ে যান, যিনি কখনও কচুবন কখনও-বা ভ্যারেন্ডার ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আকুল হয়ে গান গাইতে থাকেন, কথা নেই বার্তা নেই—দুম করে হঠাৎ মারা যান-সেই দুরন্ত—দুর্ধর্ষ দুর্বার বিজয়কুমার আমাদের সামনে। একেবারে সশরীরে দাঁড়িয়ে। আর ওঁরই পকেট থেকে আমাদের নস্যির কৌটোটা লোপাট করে দিতে হবে।

আমি বলতে যাচ্ছিলুম টেসঙ্গে সঙ্গে টেনিদা আমার কানে আবার দারুণ একটা চিমটি কষিয়ে ফ্যাসফ্যাস করে বললে, চুপ।

আমার বুকের ভেতর তখন দুর-দুর করে কাঁপছে। এখুনি—এই মুহূর্তে ভয়াবহ লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটে যাবে একটা। এত আলো, এত লোজন-এর ভেতর থেকে নস্যির কৌটো লোপাট করা। ধরা তো পড়তেই হবে, আর স্টুডিয়োসুষ্ঠু লোক সেই ফাঁকে আমাদের পিটিয়ে তুলোধোনা করে দেবে। লেপ-টেপ করে ফেলাও অসম্ভব নয়।

সূচিপত্র

আমি দেখলুম, বিজয়কুমার সেই পাজামা পরা বেঁটে লোকটার খাতা থেকে কী যেন বিড়বিড় করে পড়ে নিলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, ইয়েস—ঠিক আছে।

বলেই, এগিয়ে এসে ঘরের দাওয়াটায় বসলেন। অমনি যেন শূন্য দিয়ে একটা মাইক্রোফোন নেমে এসে ওঁর মাথার একটুখানি ওপরে থেমে দাঁড়াল। বিজয়কুমার ভাবে গগ হয়ে বলতে লাগলেন : নানা, এ আমার মাটির ঘর, আমার স্মৃতি, আমার স্বপ্ন—এ ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। জমিদারের অত্যাচারে যদি আমার প্রাণও যায়—তবু আমার ভিটে থেকে কেউ আমায় তাড়াতে পারবে না।

আমি টেনিদার কানে কানে জিজ্ঞেস করলুম, রবিঠাকুরের দুই বিঘা জমি ছবি হচ্ছে, না?

টেনিদা বললে, তা হবে।

—তা হলে বিজয়কুমার নিশ্চয় উপেন। কিন্তু আমগাছ কোথায় টেনিদা? পেছনে তো দেখছি দুটো নারকেল গাছ। উপেনের যে নারকেল গাছও ছিল, কই রবিঠাকুরের কবিতায় তো সে কথা লেখা নেই।

টেনিদা আবার আমাকে ফ্যাস-ফ্যাস করে বললে, বেশি বকিসনি, প্যালা। ব্যাপার এখন খুব সিরিয়াস—যাকে বলে পুঁদিচ্চেরি। এখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক—দ্যাখ আমি কী করি। ওই বিতিকিচ্ছিরি সিন্ধুঘোটকটাকে যদি ঠাণ্ডা না করতে পারি, তাহলে আমি পটলডাঙার টেনি শর্মাই নই!

এর মধ্যে দেখি, বিজয়কুমার বলা-টলা শেষ করে একখানা রুমাল নিয়ে চোখ মুছছেন। গেঞ্জি আর প্যান্টপরা মোটা লোকটা আকাশে মুখ তুলে চাঁছা গলায় চেঁচিয়ে উঠেছে : সাউন্ড, হাউইজ জ্যাট? (হাউজ দ্যাট) আর যেন আকাশবাণীর মতো কার মিহি সুর ভেসে আসছে : ও-কে, ও-কে-

বিজয়কুমার দাওয়া ছেড়ে উঠে পড়তেই-

টেনিদা আমার কানে কানে বললে, প্যালা, স্টেডিআর বলেই ছুটে গেল বিজয়কুমারের দিকে।

—স্যার স্যার—

বিজয়কুমার ভীষণ চমকে বললে, আরে, কম্বলরাম যে। আরে, তুই না একমাসের জন্যে দেশে গিয়েছিলি? কী ব্যাপার, হঠাৎ ফিরে এলি যে? আর স্টুডিয়োতেই বা এলি কেন হঠাৎ? কী দরকার?

আমি দম বন্ধ করে দেখতে লাগলুম।

—স্যার, আমি কম্বলরাম নই—টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল।

—তবে কি ভোম্বলরাম?—বিজয়কুমার খুব খানিকটা খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে উঠলেন : কোথা থেকে সিদ্ধি ফিদ্ধি খেয়ে আসিসনি তো? যা—যা-শিগগির বাড়ি যা, আর আমার জন্যে ভালো একটা মুরগির রোস্ট পাকিয়ে রাখ গে। রাত বারোটা নাগাদ আমি ফিরব।

-আমার কথা শুনুন স্যার, আপনার ঘোর বিপদ।

বিজয়কুমার দারুণ অবাক হয়ে কিছুক্ষণ হাঁ করে টেনিদার দিকে চেয়ে রইলেন : ঘোর বিপদ? কী বকছিস কম্বলরাম?

—আবার বলছি আপনাকে, আমি কম্বলরাম নই। আমি হচ্ছি পটলডাঙার টেনিরাম, ভালো নাম ভজহরি মুখুজ্যে!

আর বলেই টেনিদা একটানে গাল থেকে জড়লটা খুলে ফেলল : দেখছেন?

-কী সর্বনাশ। বিজয়কুমার হঠাৎ হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন।

স্টুডিয়োতে হইচই পড়ে গেল।

–কী হল স্যার? কী হয়েছে?

বিজয়কুমার বললেন, কম্বলরাম ওর গাল থেকে জড়ুল তুলে ফেলেছে।

সেই গেঞ্জি আর প্যান্টপরা মোটা ভদ্রলোক সোজা ছুটে এলেন টেনিদার দিকে।

–হোয়াট? জড়ুল খুলে ফেলেছে! জড়ুল কি কখনও খোলা যায়? আরও বিশেষ করে কম্বলরামের জড়ুল? ইসিবল! ইম্পসিবল!

টেনিদা আবার মোটা গলায় বললে, এই থার্ড টাইম বলছি, আমি কম্বলরাম নইলেপরাম, জাজিমরাম, মশারিরাম, তোশকরাম–এমনি রামেরামে–কোনও রামই নই। আমি হচ্ছি। পটলডাঙার ভজহরি মুখুজ্যে! দুনিয়াসুদ্ধ লোক আমাকে এতটাকাল টেনি শর্মা বলে জানে!

স্টুডিয়োর ভেতরে একসঙ্গে আওয়াজ উঠল; মাই গড!

বিজয়কুমার কেমন ভাঙা গলায় বললে, তা হলে কম্বলরামের ছদ্মবেশ ধরার মানে কী? নিশ্চয়ই একটা বদমতলব আছে! খুব সম্ভব আমাকে লোপাট করবার চেষ্টা। তারপর হয়তো

কোথাওবা লুকিয়ে রেখে একেবারে একলাখ টাকার মুক্তিপণ চেয়েই চিঠি দেবে আমার বাড়িতে।

সিনেমার অমন দুর্ধর্ষ বেপরোয়া নায়ক বিজয়কুমার হঠাৎ যেন কেমন চামচিকের মতো শুটকো হয়ে গেলেন আর চিচি করে বলতে লাগলেন : ওঃ গেলুম, আমি গেলুম। খুন-পুলিশ-ডাকাত।

সূচিপত্র

আর একজন কে চেঁচিয়ে উঠল : অ্যাম্বুলেন্স–ফায়ার ব্রিগেড–সৎকার সমিতি।

কে যেন আরও জোরে চ্যাঁচাতে লাগল : মড়ার খাটিয়া, হরিসংকীর্তনের দল– টেনিদা হঠাৎ বাঘাটে গলায় হুঙ্কার ছাড়ল; সাইলেন্স।

আর সেই নিদারুণ হুঙ্কারে স্টুডিয়োসুদ্ধ লোক কেমন ভেবড়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

টেনিদা বলতে লাগল : সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ! (বেশ বক্তৃতার ভঙ্গিতে হাত-পা নেড়ে বলে চলল) আপনারা মিথ্যে বিচলিত হবেন না। আমি ডাকাত নই, অত্যন্ত নিরীহ ভদ্রসন্তান। পুলিশ যদি ডাকতেই হয়, তা হলে ডেকে সিন্ধুঘোটক গ্রেপ্তার করবার জন্যে ব্যবস্থা করুন। সেই আমাদের পাঠিয়েছে বিজয়কুমারের পকেট থেকে নস্যির কৌটো-

আর বলতে হল না।

সিন্ধুঘোটক বলতেই সেই মোটা ভদ্রলোক–উঃ গেলুম-বলে একটা সোফার ওপর চিতপাত হয়ে পড়লেন। আর নস্যির কৌটো শুনেই বিজয়কুমার গলা ফাটিয়ে আর্তনাদ করলেন : প্যাক আপ–প্যাক আপ।

মোটা ভদ্রলোক তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন সোফা থেকে। তেড়ে গেলেন বিজয়কুমারের দিকে।

-যখনই শুনেছি সিন্ধুঘোটক তখনই জানি একটা কেলেঙ্কারি আজ হবে। কিন্তু প্যাক আপ চলবে না–আজ শুটিং হবেই।

বিজয়কুমার ভীষণ এক গর্জন করে বললেন, না–শুটিং হবে না। ওই অযাত্রা নাম শোনাবার পরে আমি কিছুতেই কাজ করব না আজ। আমার কন্ট্রাক্ট খারিজ করে দিন।

সূচিপত্র

–খারিজ মানে?–প্যান্টপরা মোটা ভদ্রলোক দাপাদাপি করতে লাগলেন : খারিজ করলেই হল? পয়সা লাগে নানা? যেই শুনেছি সিন্ধুঘোটক–আমারও মাথায় খুন চেপে গেছে। এক-দুই-তিন–আই মিন দশ পর্যন্ত গুনতে রাজি আছি–এর মধ্যে আপনি যদি ক্যামেরার সামনে গিয়ে না দাঁড়ান, সত্যি একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে।

বিজয়কুমার রেগে আগুন হয়ে গেলেন। মাটিতে পা ঠুকে বললেন, কী, আমাকে ভয় দেখানো। খুনোখুনি হয়ে যাবে!আস্তিন গোটাতে গোটাতে বললেন, চলে আয় ইদিকে, এক ঘুষিতে তোর দাঁত উপড়ে দেব।

–বটে। দাঁত উপড়ে দেবে! আমাকে তুই-তোকারি। বলেই মোটা লোকটা বিজয়কুমারের দিকে ঝাঁপ মারল : ইঃ, ফিল্মস্টার হয়েছেন। তারকা! যদি এক চড়ে তোকে জোনাকি বানিয়ে দিতে না পারি–

আমি হাঁ করে ব্যাপারটা দেখছিলুম আর আমার মাথার ভেতরে সব যেন কীরকম তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মোটা লোকটা ঝাঁপিয়ে এগিয়ে আসতেই কেলেঙ্কারির চরম। ঘরভর্তি ইলেকট্রিকের সরু মোটা তার ছড়িয়ে ছিল, লোকটার পায়ে একটা তার জড়িয়ে গেল দুড়ুম করে আছাড় খেল সে। একটা আলো আছড়ে পড়ল তার সঙ্গে। তক্ষুনি দুম-ফটাস!

কোথা থেকে যেন কী কাণ্ড হয়ে গেল-স্টুডিয়ো জুড়ে একেবারে অথই অন্ধকার!

তার মধ্যে আকাশ-ফাটানো চিৎকার উঠতে লাগল : চোর–ডাকাত-খুন-অ্যাঁম্বুলেন্স–সৎকারসমিতি-হরিসংকীর্তন-মড়ার খাটিয়া-

আর সেই অন্ধকারে কে যেন কাকে জাপটে ধরল, দুমদাম করে কিলোতে লাগল। অনেক গলার আওয়াজ উঠতে লাগল : মার-মার–মার-

টেনিদা টকাৎ করে আমার কানে একটা চিমটি দিয়ে বললে, প্যালা–এবার-কুইক-

কীসের কুইক তা আর বলতে হল না! সেই অন্ধকারের মধ্যে টেনে দৌড় লাগালুম দুজনে।

জয় মা তারা স্টুডিয়োর বাইরে বাগানেও সব আলো নিবে গেছে, গেটে যে দারোয়ান বসেছিল, সে কখন গোলমাল শুনে ভেতরে ছুটে এসেছে। আমরা ভোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলুম, তারপর ঢোকবার সময় ডানদিকে যে পালানোর রাস্তা দেখেছিলুম, তাই দিয়ে আরও অনেকখানি দৌড়ে দেখি–সামনে একটা বড় রাস্তা।

কিন্তু সিন্ধুঘোটক?

তার দলবল?

না–কেউ কোথাও নেই। শুধু একটু দূরে মিটার তুলে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে, আর তাতে বসে মস্ত গালপাট্টা দাড়িওলা এক শিখ ড্রাইভার একমনে ঝিমুচ্ছে।

টেনিদা বললে, ভগবান আছেন প্যালা, আর আমাদের পায় কে! সর্দারজী–এ সর্দারজী–

সদারজী চোখ মেলে উঠে বসে ঘুম-ভাঙা জড়ানো-গলায় বললে, কেয়া হুয়া?

–আপ ভাড়া যায়েগা?

–কাহে নেহি যায়েগা? মিটার তো খাড়া হ্যায়।

–তব চলিয়ে–বহুৎ জলদি।

–কাঁহা?

—পটলডাঙা।

—ঠিক হ্যায়। বৈঠিয়ে।

গাড়ি ছুটল। একটু পরেই দেখলুম আমরা রসা রোডে এসে পড়েছি। তখনও পথে সমানে লোক চলছে, ট্রাম যাচ্ছে বাস ছুটছে।

আমি তখনও হাঁপাচ্ছি।

বললুম, টেনিদা, তা হলে সত্যিই সিন্ধুঘোটকের হাত থেকে বেঁচে গেলুম আমরা।

টেনিদা বললে, তাই তো মনে হচ্ছে!

—কিন্তু ব্যাপার কী, টেনিদা? হঠাৎ গেঞ্জি-রা ওই মোটা লোকটা অত চটে গেল কেন, আর নস্যির কৌটোর কথা শুনেই বা বিজয়কুমার—

টেনিদা কটাং করে আমায় একটি চিমটি কেটে বললে, চুলোয় যাক। পড়ে মরুক তোর সিন্ধুঘোটক আর যমের বাড়ি যাক তোর ওই বিজয়কুমার। এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পারলে বাঁচি আমরা দুজনে।

আমাদের নিয়ে গাড়ি যখন পটলডাঙার মোড়ে এসে থামল—তখন মহাবীরের পানের দোকানের ঘড়িতে দেখিঠিক দশটা বাজতে আট মিনিট।

মাত্র তিন ঘণ্টা!

তিন ঘণ্টার মধ্যে এত কাণ্ড—একেবারে রহস্যের খাসমহল। কিন্তু তখনও কিছু বাকি ছিল।

টেনিদা বললে- সর্দারজী, কেতনা হুয়া?

পরিষ্কার বাংলায় সর্দারজী বললে, পয়সা লাগবে না-বাড়ি চলে যাও!

আমরা দুজনেই একসঙ্গে চমকে উঠলুম—সে কী!

হঠাৎ সর্দারজী হা-হা করে হেসে উঠল। একটানে দাড়িটা খুলে ফেলে বললে, চিনতে পারছ?

আমরা লাফিয়ে পেছনে সরে গেলুম। টেনিদার মুখ থেকে বেরুল : ডি-লা-গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস!

সদারজী আর কেউ নয়—স্বয়ং সেই অবলাকান্ত। সেই মেফিস্টোফিলিসদের একজন!

আর একবার অট্টহাসি, তারপরেই তীরবেগে ট্যাক্সিটা শিয়ালদার দিকে ছুটে চলল।

আমি বুদ্ধি করে নম্বরটা পড়তে চেষ্টা করলুম, কিন্তু পড়া গেল না—একরাশ নীল ধোঁয়া বেরিয়ে গাড়ির পেছনের নম্বর-টম্বর সব ঢেকে দিয়েছে!

সিনেমা দেখতে গিয়েছিলুম

সিনেমা দেখতে গিয়েছিলুম-বেশ ভালো একটা উপদেশপূর্ণ ইংরেজী বই, এইসব বলে-টলে তো কোনওমতে বাড়ির বকুনির হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। কিন্তু মেজাজ ভীষণ খারাপ হয়ে রইল। বলতে ভুলে গেছি, গাড়িতে বসেই মুখের রং-টংগুলো ঘসেটসে তুলে ফেলেছিলুমআর বাড়িতে ঢুকেই সোজা বাথরুমে ঢুকে একদম সাফসুফ হয়ে নিয়েছিলুম। ভাগ্যিস, অত রাতে কারও ভালো করে নজরে পড়েনি, নইলে শেষ পর্যন্ত হয়তো একটা কেলেঙ্কারিই হয়ে যেত।

কিন্তু ব্যাপারটা কী হল? কেন আমাদের অমন করে ধরে নিয়ে গেল সিন্ধুঘোটক, কেনই বা মুখে রং মেখে রং সাজাল, আর জয় মা তারা স্টুডিয়োর ভেতরেই বা এ সব কাণ্ড কেন ঘটে গেল—সে-সবের কোনও মানেই বোঝা যাচ্ছে না! আরও বোঝা যাচ্ছে না, দাড়ি লাগিয়ে অবলাকান্ত কেনই বা আমাদের বিনে পয়সায় পৌঁছে দিলে, আমরা বিজয়কুমারের নস্যির কৌটো লোপাট না করেই পালিয়ে এসেছি জেনেও হাতে পেয়ে সে আমাদের ধরে নিয়ে গিয়ে গুম করল না কেন!

ভীষণ গোলমেলে সব ব্যাপার। মানে, সেই সব অঙ্কের চাইতেও গোলমেলে—যেখানে দশমিকের মাথার ওপর আবার একটা ভেঙ্কুলাম থাকে, কিংবা তেল মাখা উঁচু বাঁশের ওপর থেকে এক কাঁদি কলা নামাতে গিয়ে একটা বাঁদর ছ ইঞ্চি ওঠে তো সোয়া পাঁচ ইঞ্চি পিছলে নেমে আসে!

সকালে বসে বসে এই সব যতই ভাবছি, ততই আমার চাঁদির ওপরটা সুড়সুড় করছে, গলার ভেতরটা কুটকুট করছে, কানের মাঝপথে কটকট করছে আর নাকের দুপাশে সুড়সুড় করছে। ভেবে-চিন্তে থই না পেয়ে শেষে মনের দুঃখে টেবিল বাজিয়ে বাজিয়ে আমি সত্যেন দত্তের লেখা বিখ্যাত সেই ভুবনের গানটা গাইতে শুরু করে দিলুম :

ভুবন নামেতে ব্যাদড়া বালক
তার ছিল এক মাসি,

আহা—ভুবনের দোষ দেখে দেখিত না
সে মাসি সর্বনাশী।
শেষে-কলাচুরি মুলোচুরি করে বাড়ে
ভুবনের আশকারা,
চোর হতে পাকা ডাকাত হল সে
ব্যবসা মানুষ মারা-

এই পর্যন্ত বেশ করুণ গলায় গেয়েছি, এমন সময় হঠাৎ তেতলা থেকে অ্যাঁয়সা মোটা ডাক্তারি বই হাতে নিয়ে মেজদা তেড়ে নেমে এল।

—এই প্যালা, কী হচ্ছে এই সকালবেলায়?

বললুম, গান গাইছি।

—এর নাম গান? এ তো দেখছি একসঙ্গে স্টেনগান, ব্রেন-গান, অ্যাঁন্টি-এয়ারক্রাফট গান—মানে স্বর্গে মা সরস্বতীর গায়ে পর্যন্ত গিয়ে গোলা লাগবে।

আমি বললুম, তুমি তো ডাক্তার—গানের কী জানো? এর শেষটা যদি শোনোতা আরও করুণ। বলে আবার টেবিল বাজিয়ে যেই শুরু করেছি-

ধরা পড়ে গেল, বিচার হইল
ভুবনের হবে ফাঁসি,
হাউ হাউ করে লাড়-মুড়ি বেঁধে
ছুটে এল তার মাসি—

অমনি বেরসিক মেজদা ধাঁই করে ডাক্তারি বইয়ের এক ঘা আমার পিঠে বসিয়ে দিলে। বিচ্ছিরি রকম দাঁত খিঁচিয়ে বললে, আরে, যা খেলে কচুপোড়া। মাথা ধরিয়ে দিলি তো! লেখা নেই, পড়া নেই, বসে বসে ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাচ্ছে।

-বা-রে, এই তো সব আমাদের স্কুলে সামার ভ্যাকেশন শুরু হল, এখুনি পড়ব?

–তবে বেরো, রাস্তায় গিয়ে চ্যাঁচা।

আমি গাঁ-গাঁ করে বেরিয়ে এলুম রাস্তায়! এসব বেরসিকদের কাছে সঙ্গীতচর্চা না করে আমি বরং চাটুজ্যেদের রকে বসে পটলডাঙার নেড়ী কুকুরগুলোকেই গান শোনাব।

কিন্তু গান আর গাইতে হল না। তার আগেই দেখি টেনিদা হনহন করে আসছে। আসছে আমার দিকেই।

আমায় দেখেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললে, প্যালা, কুইক কুইক। তোর কাছেই যাচ্ছিলুম-চটপট চলে আয়।

—আবার কী হল?

টেনিদা বললে, সিন্ধুঘোটক।

—অ্যাঁ! কপাৎ করে আমি একা খাবি খেলুম : সিন্ধুঘোটক? কোথায়?

-আমাদের বাড়িতে। বৈঠকখানায় বসে আছে।

—অ্যাঁ।

তখুনি দু চোখ কপালে তুলে আমি প্রায় রাস্তার মধ্যেই ধপাস করে বসে পড়তে যাচ্ছিলুম, টেনিদা খপ করে আমাকে ধরে ফেলল। বললে, দাঁড়া না, এখুনি ঘাবড়াচ্ছিস কেন? চলে আয় আমার সঙ্গে–

চলেই এলুম।

বুকের ভেতরটা হাঁকপাঁক করছিল। কিন্তু এই বেলা সাড়ে নটার সময়—টেনিদাদের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে, সিন্ধুঘোটক আমাদের আর কী করবে?

কিংবা, এসব মারাত্মক লোককে কিছুই বিশ্বাস নেই, রামহরি বটব্যাল কিংবা যদুনন্দন আঢ্যের গোয়েন্দা উপন্যাসে দিনে-দুপুরেই যে কত বড় দুর্ধর্ষ ব্যাপার ঘটে যায় সে-ও তো আর আমার অজানা নেই।

আমি আর একবার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, টেনিদা সঙ্গে দস্যুদল—মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র

–কিছু না–কিছু না, একেবারে একা।

–পুলিশে খবর দিয়েছ?

—কিছু দরকার নেই। তুই আয় না—

জয় মা তারা বলতে গিয়ে সেই অলক্ষুণে স্টুডিয়োটাকে মনে পড়ল, সামলে নিয়ে বললুম, জয় মা কালী—আর ঢুকে পড়লুম টেনিদাদের বাড়িতে।

আর ঢুকেই দেখি-চেয়ারে বসে সিন্ধুঘোটক।

সেই চেহারাই নেই। গায়ে মুগার পাঞ্জাবি, হাতে গোটাকয়েক আংটি, একমুখ হাসি। বললে, এসো প্যালারাম এসোতোমার জন্যেই বসে আছি।

আমি হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলুম। তারপর ভয়টা কেটে গেলে জিজ্ঞেস করলুম, আপনি—আপনি কে?

–আমার নাম হরিকিঙ্কর ভড় চৌধুরী। মনোরমা ফিল্ম কোম্পানির নাম শুনেছ তো? আমি সেই ফিল্ম কোম্পানির মালিক।

–কিন্তু কাল রাতে আমাদের নিয়ে আপনি এসব কী কাণ্ড করলেন?

–খুলে বললেই সবটা বুঝতে পারবে। এসে বোসো বলছি।

তারপর যা বললেন

তারপর যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই :

তিনি একটা ছবি আরম্ভ করবেন, বিজয়কুমারকে তার নায়ক করতে চান। কিন্তু বিজয়কুমার বলে বসেছেন গজানন মাইতির পথে পথে বিপদে ছবির কাজ শেষ না হলে তিনি কোনও ছবিতে নামবেন না। এখন গজানন মাইতির সঙ্গে হরিকিঙ্কর ভড় চৌধুড়ীর ঘোর শত্রুতা। হরিকিঙ্কর তাই পণ করলেন গজাননের ছবির শুটিং পণ্ড করে দেবেন।

কাল রাতেই ছিল গজাননের ছবির প্রথম শুটিং।

গজানন ঘুঘু লোক—সে হুকুম দিয়েছিল, তার শুটিং-এ কোনও বাইরের লোক ঢুকতে পারবে না। সুতরাং এমন কাউকে দরকার যে চট করে স্টুডিয়োতে ঢুকে যেতে পারে। আর সে পারে কম্বলরাম।

কিন্তু কম্বলরাম তো দেশে চলে গেছে। তাই তিনি চারদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন—ঠিক কম্বলরামের মতো একটা লোক কোথায় পাওয়া যায়।

তারপর গড়ের মাঠে আমাদের দেখে–

–কিন্তু বিজয়কুমারের নস্যির কৌটোর মানে কী? আর সিন্ধুঘোটক সাজবারই বা আপনার কী দরকার ছিল?

হরিকিঙ্কর মিটি মিটি হাসলেন। বিজয়কুমার ছেলেবেলায় খুব নস্যি নিতেন। একদিন স্কুলের ক্লাসে বসে নস্যি নিচ্ছেন, হেডমাস্টারমশাই দেখতে পেয়ে কান ধরে নিয়ে গিয়ে আচ্ছা করে বেত পিটিয়ে দিলেন সেই থেকে নস্যির নাম শুনলেই বিজয়কুমার খেপে যান। এখন ফিল্মে ঢুকেও বিজয়কুমারের প্রতিজ্ঞা—তার ছবি

তোলার সময় কেউ নস্যি টানলে কিংবা নস্যির নাম উচ্চারণ করলে তিনি তক্ষুনি স্টুডিয়ো থেকে চলে যাবেন। আর সিন্ধুঘোটক?

—লোকে আড়ালে গজাননকে সিন্ধুঘোটক বলে। গজানন তা জানেন, তাঁর ধারণা কথাটা অপয়া, শুটিংয়ের সময় ওটা কানে গেলে একটা কিছু কেলেঙ্কারি হবেই।

টেনিদা বললে, এর জন্যে এত কাণ্ড করলেন আমাদের নিয়ে? যদি গজাননবাবু আমাদের ধরে ঠেঙিয়ে দিতেন, তা হলে?

-তা হলে আমি তোমাদের হাসপাতালে পাঠাতুম। সে-সব ব্যবস্থা ছিলই।

হরিকিঙ্কর আবার ফিক ফিক করে হাসতে লাগলেন : যাক সব কিছুই ভালোয় ভালোয় হয়ে গেছে, আজ সকালে নিজে থেকে এসেই বিজয়কুমার আমার সঙ্গে ছবির কন্ট্রাক্ট সই করে গেছেন।

—কিন্তু আপনি আমাদের ঠিকানা জানলেন কী করে?

-কাল অবলাকান্ত তোমাদের রাস্তার মোড়ে পৌঁছে দিয়ে গেল না? আর পটলডাঙার টেনি শর্মা তো বিখ্যাত লোক, তাকে খুঁজে বের করতে কতক্ষণই বা লাগে?

আমরা চুপ!

হরিকিঙ্কর বললেন, এইবার কাজের কথা, তোমাদের কিছু পুরস্কার দেব বলেছিলুম। অনেক কষ্ট করেছ, রং-চং মাখিয়ে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছি-আমার একটা কৃতজ্ঞতা তো আছে। এই প্যাকেট তোমাদের দুজনকে দিয়ে গেলুম, আমি যাওয়ার পরে খুলে দেখো।

কাগজে মোড়া দুটো ভারি বাক্স তিনি তুলে দিলেন আমাদের দুজনের হাতে। টেনিদা গাঁইগুঁই করে বললে, আমাদের একদিন ছবির শুটিং দেখাবেন স্যার?

–আলবাত–আলবাত। যেদিন ভালো শুটিং হবে, সেদিন আগে থেকে খবর দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে তোমাদের নিয়ে যাব। চাই কি জনতার দৃশ্যে নামিয়ে দিতে পারি।

একটু হেসে আবার বললেন, সেখানে গিয়ে যেন নস্যির কৌটো-ফৌটো বলো না যেন আবার।

–পাগল! আর বলে!–আমরা দুজনে একসঙ্গে সাড়া দিয়ে উঠলাম।

–তা হলে আমি, আমি–টা-টা–

হরিকিঙ্কর চলে গেলেন। আমরা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলুম, গলির মোড়ে একটা মস্ত লাল মোটর দাঁড়িয়েছিল, সেইটেতে চড়ে তিনি দেখতে-দেখতে উধাও হলেন।

তারপর হাতের প্যাকেট দুটো খুললুম আমরা।

কী দেখলুম?

টেনিদার হাতের প্যাকেটে একটা ট্রানজিস্টার রেডিয়ো আর আমার প্যাকেটে একটা ক্যামেরা।

দুটোই নতুন–ঝকঝক করছে।

আর আকাশ ফাটিয়ে টেনিদা হাঁক ছাড়ল : ডি-লা-গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস–

আমি বললুম, ইয়াক-ইয়াক!

www.bengaliebook.com